Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার

রোলঃ 227020925

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার

রোলঃ 227020925

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারীবাদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া আক্তার, আইডিঃ 227020925 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নারীবাদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সুমাইয়া আক্তার

আইডিঃ 227020925

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।
আলহামদুলিল্লাহি আস্তা'ইনুহু ওয়া আস্তাগফিরুহু ওয়া নাউ'যুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা মাইয়্যাহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ। ওয়া মা-ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশ-হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসুলুহু। আল্লহুম্মা সল্লি আ'লাইহি আল্লহুম্মা বারিক আ'লাইহি।ফাআউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম। আস্সালামুআলাইকুম ওরহমতুল্লহি ওয়াবারকাতুহু।আমার থিসিস এর বিষয় হচ্ছে নারীবাদ।

নারীবাদ

"Feminism বা নারীবাদ" -এর উৎপত্তি

Feminism শব্দটি লাটিন শব্দ "Femina" শব্দ থেকে এসেছে। "Femina" এর অর্থ অচ্ছে, "The Woman" । ১৮৯০ সালে প্রথমবারের মত এই শব্দ আমাদের সামনে আসে। বিশেষ করে নারীদের সমতা বিধান এবং অধিকার রক্ষার্থে। ফ্রেঞ্চ দার্শনিক "Charles Fourier" ১৮৪৭ সালে এই শব্দটিকে "Coined" করেন।

নারীবাদ বলতে বোঝায়, একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈ আন্দোলন; যার উদ্দেশ্য নারীর সমানাধিকার ও আইনী সুরক্ষা। এর আওতায় রা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক থিয়োরি এবং দর্শন। ১৯৪২ সালে ক্যাথরিন হেম সর্বপ্রথম 'নারীবাদী আন্দোলন' কথাটি ব্যবহার করে 'Woman of the সিনেমায়।

তবে ১৮৯০ সালে জেন্ডার ইকুয়্যালিটি বা লিঙ্গ সমতা বিধানে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে এই মুভমেন্ট শুরু হয়। বিশেষ করে যারা নিপীড়িত নারী তাদের নিয়ে।সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমতার বিশ্বাস । যদিও মূলত পশ্চিমে উদ্ভূত, নারীবাদ বিশ্বব্যাপী উদ্ভাসিত হয়

এবং এর পক্ষে কার্যকলাপের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় নারীর অধিকার এবং স্বার্থ।

তথ্য:https://cdn.britannica.com & https://www.backspace-journal.com

◆১৮৩৭ খ্রিঃ ফরাসি দার্শনিক ও ইউটোপীয় সমাজবাদী চার্লস ফুরিয়ে প্রথম '**নারীবাদ**' শব্দটির আনুষ্ঠানিক ব্যবহার করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। "**নারীবাদ**" (feminism) এবং "নারীবাদী" (feminist) শব্দদুটি ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭২ এ, যুক্তরাজ্যে ১৮৯০ এ, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১০ এ।অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান অনুযায়ী "নারীবাদী" শব্দের উৎপত্তিকাল ১৮৫২এবং "নারীবাদ" শব্দের ক্ষেত্রে তা ১৮৯৫ সময়কাল, সংস্কৃতি ও দেশভেদে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নারীবাদীরা বিভিন্ন কর্মসূচি ও লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করেছেন। অধিকাংশ পাশ্চাত্য নারীবাদী ঐতিহাসিক মনে করেন যে যে সমস্ত আন্দোলন নারীর অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করেছে তাদের সব কয়টিকেই নারীবাদী হিসেবে গণ্য করা উচিত; তারা নিজেদেরকে ঐ নামে চিহ্নিত না করলেও এর অন্যথা হয় না।অন্য ঐতিহাসিকরা মনে করেন 'নারীবাদী' শব্দটি শুধু আধুনিক নারীবাদী আন্দোলন ও তার উত্তরসূরি আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই দ্বিতীয় দলের ঐতিহাসিকরা পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোকে চিহ্নিত করতে "উপনারীবাদ" কথাটির অবতারণা করেছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাস তিনটি "তরঙ্গ"-এ বিভক্ত। নির্দিষ্ট কিছু নারীবাদী লক্ষ্যের এক একটি আঙ্গিক নিয়ে এক একটি ঢেউ কাজ করেছে। প্রথম ঢেউ-এর সময়ে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগে নারীর ভোটাধিকার অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ঢেউ বলতে ১৯৬০ এর দশকে নারীমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হওয়া মতাদর্শ ও কর্মসূচীসমূহকে বোঝায়। এই সময়ে নারীর সামাজিক ও আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়। তৃতীয় তরঙ্গ হল দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯৯০ এর দশক থেকে শুরু হওয়া একটি ভিন্ন অভিমুখী ধারাবাহিকতা।এই পর্যায়ে লিঙ্গনির্ভর প্রথাগত সামাজিক মূল্যবোধের একাধিক আমূল পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে ও হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: https://bn.m.wikipedia.org/

নারীবাদের ইতিহাস

পশ্চিমা ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়ে,নারীরা ঘরোয়া ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে জনজীবন পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপে নারীদের সম্পত্তির মালিকানা , পড়াশোনা বা জনজীবনে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল । ফ্রান্সে ১৯ শতকের শেষের দিকে, তারা তখনও জনসমক্ষে তাদের মাথা ঢেকে রাখতে বাধ্য ছিল এবং, জার্মানির কিছু অংশে, একজন স্বামীর তখনও তার স্ত্রীকে বিক্রি করার অধিকার ছিল। এমনকি 20 শতকের প্রথম দিকে, ইউরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ অংশে (যেখানে ফেডারেল সরকার তা করার অনেক আগেই বেশ কয়েকটি অঞ্চল এবং রাজ্য মহিলাদের ভোটাধিকার দিয়েছিল) নারীরা ভোট দিতে পারেনি বা নির্বাচন করতে পারেনি। নারীদের পুরুষ প্রতিনিধি ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, তা সে পিতা, ভাই, স্বামী, আইনি এজেন্ট, এমনকি পুত্রই হোক না কেন। বিবাহিত মহিলারা তাদের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাদের সন্তানদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারে না। অধিকন্তু, নারীদের শিক্ষার সামান্য বা কোন সুযোগ ছিল না এবং বেশিরভাগ পেশা থেকে তাদের বাধা দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের কিছু অংশে আজও নারীদের ওপর এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রয়েছে।

The origin and development of Feminist Movements in the world:

বিশ্বে নারী আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সাবেকি রাজনৈতিক তত্ত্ব বা আলোচনায় লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। সরকারিভাবে নারী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ, বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু নারীবাদী প্রবন্ধ ও রচনা পাওয়া গেলেও ফরাসি বিপ্লবকেই (১৭৮৯) নারীবাদী আন্দোলনের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী সেখানকার মহিলাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নিজেদের পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টিকে তাঁরা আন্দোলনের সামগ্রিক 'স্বাধীনতা'র স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মহিলারা শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা পিতৃতন্ত্রের অবসান ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরব হন। ফরাসি বিপ্লব সফল হল, কিন্তু মহিলাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। ১৭৯১ সালের

নতুন সংবিধানে পুরুষদের সীমিত ভোটাধিকার স্বীকার করা হল, কিন্তু মহিলাদের বঞ্চিত করা হল। এ ছাড়া নবগঠিত ফরাসি সংসদে 'পুরুষদের অধিকারের ঘোষণাপত্র' (Declaration of

the Rights of Man) গৃহীত হল। এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফরাসি মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকার কড়া হাতে এই আন্দোলনকে দমন করে। প্রসঙ্গত, মাদাম গুৎজ নামক এক মহিলা বিপ্লবী দাবি করেন, নারীদের যদি ফাঁসিতে যাওয়ার অধিকার থাকে, তাহলে তাদের সংসদে যাওয়ার অধিকার থাকবে না কেন? এই প্রতিবাদের পরিণতিতে মাদামকে সংসদের পরিবর্তে ফাঁসি কাঠেই যেতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো, মন্তেস্কু প্রমুখ এই সময়ের বিখ্যাত দার্শনিকদের দর্শন ও রচনায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। নারীকে তাঁরা ভাবাবেগের আধার হিসেবে, মাতা, কন্যা, স্ত্রী-র সার্থক ভূমিকা পালনকারী হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু তারাও যে পুরুষের মতো যুক্তিবাদী চিন্তা করতে সক্ষম, তাদেরও যে যুক্তিবাদী মনন আছে, একথা এইসব দার্শনিক মনে করতেন না। এই প্রেক্ষাপটে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট (Mary Wollstonecraft) নামক এক ফরাসি মহিলা Vindication of the Rights of Women' (1792) নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, সমসাময়িক তথা উত্তরকালের নারীবাদীদের তা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়েই উদারপন্থী নারীবাদের সূত্রপাত ঘটে।

ফরাসি দেশের নারীবাদী আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ ইউরোপের অন্যান্য দেশে পৌঁছে যায়। ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডের নারীরা বেশ কিছু দাবির ভিত্তিতে 'চার্টার অব ডিম্যান্ডস' পেশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। এরই পাশাপাশি বিশ্বের আর এক ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকাতে নারীদের বৈপ্লবিক ভূমিকার এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চের ধর্মঘটে। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহাগেন-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৭টি দেশের একশত নারী প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং বিশ্ববরেণ্য নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদ্যাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নারী সংগঠনগুলি এই দাবিকে সমর্থন জানায়। অবশেষে ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্বত্র শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটতে থাকে। বিশের দশকে নারীদের আইনগত অধিকার দাবি করে অনেক নারীবাদী লেখিকার লেখনী গর্জে উঠেছিল। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভার্জিনিয়া উলফ্, সুজান সায়লেন্স প্রমুখ।

এসময়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে চুক্তির সম অধিকার, বিবাহ, বাচ্চার দেখভাল এবং নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলছিলো। উনিশ শতকের শেষের দিকে এ আন্দোলন নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন, বিশেষভাবে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনে পরিণত হয়, যদিও কিছু নারীবাদীগণ তখনো নারীদের লিঙ্গগত, পুনরুৎপাদনমূলক এবং অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন।এছাড়াও এ শতকের শেষের দিকে ব্রিটেনের অস্ট্রেলিয়ান

উপনিবেশগুলোতে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। যেসব উপনিবেশ নিউজিল্যান্ডের স্ব-শাসিত অবস্থায় ছিলো, সেগুলোতে ১৮৯৩ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয় এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ১৮৯৫ সালে নারীদের ভোটাধিকার এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেয়। পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়া ১৯০২ সালে নারীদের ভোটাধিকার প্রবর্তন করে।

ব্রিটেনে ভোটাধিকার আন্দোলনকারীরা নারীদের ভোট দেয়ার অধিকারের সপক্ষে প্রচার শুরু করে। ১৯১৮ সালে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়সী নারী যাদের সম্পত্তি আছে তাদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। ১৯২১ সালে এই আইন সংশোধন করে ২১ বছরের বয়সী সকল নারীর জন্য ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হয়।এমিলিন পাঙ্ঘরস্ট ছিলেন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অ্যাক্টিভিস্ট, যাকে টাইম পত্রিকা একুশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছে, " তিনি আমাদের সময়ের নারীদের সম্পর্কে ধারণা দেন এবং সমাজকে ঝাঁকি দিয়ে এমন অবস্থানে নিয়ে গেছেন যেখান থেকে পিছু ফিরে তাকানোর সুযোগ নেই।"

যুক্তরাষ্ট্রে তালিকায় লুক্রেশিয়া মট, এলিজাবেথ ক্যাডি স্টানটোন, সুসান বি এন্থনি এর নাম উল্লেখযোগ্য। তারা সকলেই ভোটাধিকার আন্দোলনের পূর্বে দাস প্রথা বিলোপে সংগ্রাম করেছেন। তারা কুকার এর আত্মিক সমতার ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, যেখানে নারী এবং পুরুষকে ঈশ্বরের অধীনে সমান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।১৯১৯ সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৯ তম সংশোধনীর সাথে সাথে নারীবাদের প্রথম ঢেউ শেষ হয়েছে বলে মনে করা হয়, কেননা এ সংশোধনীতে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। এরপরে নারীবাদীরা নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ এর যুগে প্রবেশ করেন যেখানে সামাজিক ও সংস্কৃতিগত বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অসমতার বিষয়গুলো সামনে আসে।

জাতিসংঘ-ব্যবস্থায় নারীবাদ

নারীবাদী আন্দোলন জাতিসংঘ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘ নারীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহবান করেছে। মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭৫-১৯৮৪ পর্যন্ত জাতিসংঘ নারী উন্নয়নের দশক হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সম্মেলন ও দশকব্যাপী কর্মকান্ডের দরুন পরবর্তী সময়ে কোপেন হেগেন (১৯৮০) ও নাইরোবিতে (১৯৮৫) অনুষ্ঠিত সম্মেলনে নারী উন্নয়নের বৃহৎ সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং নারীর লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়। এ সব সম্মেলনের ফলে বিশ্বব্যাপী নারীরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, নারীবাদ একটি অভিন্ন ও সমসত্ত্ব মতবাদ নয়; নারীবাদে বিভিন্ন অঞ্চল, শ্রেণি, জাতি ও দেশের নারীর ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ ও উদ্বেগকে স্বীকার করতে হবে এবং মূল্য দিতে হবে। নারীর বিভিন্ন চাহিদা ও উদ্বেগের প্রতি সাড়া দিয়ে নারীবাদকে বৈচিত্র্য প্রাধান্য দিতে হবে এবং এর বিভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত সর্বশেষ বিশ্ব নারী সম্মেলনে প্লাটফর্ম অফ অ্যাকশন (পিএফএ) নামে কর্মপন্থা স্বাক্ষরিত হয়, যাতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 'জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন'-এর লক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলের নাম দেয়া হয় 'জেন্ডারকে মূলধারায় আনয়ন', যার অর্থ হলো সকল নারী ও পুরুষ 'পূর্ণ মানবাধিকার অর্জনের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগও লাভ করবে।' এরই প্রেক্ষাপটে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য বিলোপের সনদ (সিডও) গৃহীত হয় (১৯৭৯) এবং নারীর জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল আকারে ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাস হয়।

বৈশ্বিক পর্যায়ে গৃহীত উপরোক্ত নীতি ও কর্মকান্ড নারীবাদ ও নারীবাদী আন্দোলনকে জোরদার করেছে। মত পার্থক্য সত্ত্বেও সকল নারী ও নারী তাত্ত্বিকগণ একমত হন যে, নারী বৈষম্য, অসমতা, ও অন্যায়ের শিকার এবং এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম ও আন্দোলন তাদের ন্যায়সঙ্গত অভিযান, সত্য প্রতিষ্ঠার অভিযান।

২০০৪ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বেতনভূক্ত কর্ম এবং বেতনহীন গৃহকর্মে অংশগ্রহণ করলেও নারীরা গড়ে পুরুষের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর গ্রামাঞ্চলে নারীরা পুরুষের চেয়ে গড়ে ২০ শতাংশ বেশি কাজ

করে। ২০০১ সালে জাতিসংঘের প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নারী সংগঠনগুলোর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তথ্য প্রদান করা হয় যে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ হলো নারী এবং মোট নারী-পুরুষ মিলিত শ্রমের ৬৬ শতাংশ শ্রম দান করে নারীরা। এতদসত্ত্বেও নারী পায় বিশ্বের মোট আয়ের মাত্র ১০ শতাংশ এবং বিশ্বের মোট সম্পদের মাত্র ০১ শতাংশের মালিক হয় নারী। নারীবাদ এ স্বচ্ছ অসমতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সকল বৈষম্য দূর করে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের জন্য কাজ করে।

তথ্যসূত্র:https://bn.banglapedia.org/

বাংলাদেশে নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রথা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নারীরা পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে পরস্পর ভিন্ন এবং পাশ্চাত্য নারীর অবয়ব বাংলাদেশী নারীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বাংলাদেশী নারীদের জন্য প্রযোজ্যও নয়। পাশ্চাত্যকে যদি নারীবাদের উৎপত্তিস্থল হিসেবে দাবি করা হয়; তবে বাংলাদেশে সহজাত নারীবাদের সৃষ্টি হয়েছে, যা পাশ্চাত্যের নারীবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মনে করতেন নারী সামাজিক জীব; নারীকে নিজের কথা নিজেকে সমস্বরে বলতে হবে, অন্য কেউ নারীর হয়ে বলবে না। রোকেয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না এবং পশ্চিমা নারীবাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না; শ্বেতাঙ্গ নারীবাদীদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তার সুলতানার স্বপ্ন (১৯২৪) বইয়ে নারী পরিচালিত বৈচিত্র্যপূর্ণ, সমতাভিত্তিক কাল্পনিক নারীবিশ্বের চিত্র তুলে ধরেছেন, যা হবে শোষণ থেকে মুক্ত। অস্তিত্বের জন্য সুলতানার সংগ্রাম এবং নারীমুক্তির জন্য তার কাজ প্রভৃতি ছিল নারীবাদের উদাহরণ। রোকেয়া তার লেখনীর মধ্য দিয়ে সমাজের কুসংস্কার, অবরোধ প্রথার অতিরিক্ত প্রভাব, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, নারী শিক্ষা, নারীর প্রতি সামাজিক অবমাননা, নারীর অধিকার এবং নারী জাগরণের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন।

এছাড়াও নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন রকম অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে একের পর এক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রকম্পিত হয় বিশ্ব। শিক্ষা,সম্পত্তি,কাজের সুযোগ,শ্রমবাজারে নারীর অবস্থান,নারীর প্রতি সমাজের মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষ্যে পৃথিবীর

দেশে দেশে নারীরা জেগে উঠেন। ভারতবর্ষ ও আজকের বাংলাদেশেও নারী জাগরণের ঢেউ এসে লাগে।

গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকেই এদেশের নারীরা জেগে উঠতে শুরু করে। জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীরা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীগুলোকেও সামনে তুলে ধরে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের নারীরা অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে নারী অধিকারের বিষয়টি রাষ্ট্র-সরকারের কাছেও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী সরকারের এক আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ মহিলা সমিতি। এর বাইরেও নানারকম সংঘ,সমিতি,সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীরা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রাখে।
বিশ শতকের নারী জাগরণ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতারই একটি প্রবাহ 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কার্যক্রম শুরু করে ২০০৬ সালে। দেশের তৃণমূলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট সক্রিয় নারী সংগঠন এবং ব্যক্তি নারীনেত্রীদের জন্য একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই ছিল এর প্রাথমিক লক্ষ্য। যাতে করে তৃণমূলের নারীরা একটি জাতীয়ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেদের চিন্তা-চেতনা,দাবী-দাওয়া তুলে ধরতে পারেন। যাতে নারীদের একটি জাতীয়ভিত্তিক ঐক্য গড়ে উঠে,যাতে তাদের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়,যাতে তাদের অধিকারের কথা পৌঁছে দিতে পারেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যাতে তাদের কণ্ঠ নারী জাগরণের বৈশ্বিক চেতনার সাথে একসুরে মিলতে পারে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ সূচনালগ্ন থেকেই ক্ষুধামুক্ত,আত্মনির্ভরশীল, সামাজিক ন্যায় ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে গণজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে আসছে। স্থানীয় সরকার,তৃণমূলের নারী-পুরুষ,ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত,ক্ষমতায়িত ও অনুপ্রাণিত করার বহুমূখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। যাতে তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের এলাকা পরিবর্তন ও উন্নয়নের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে ও তাদের নেতৃত্বে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠবে।
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে,'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি'। বিদ্যমান জেন্ডার অসমতা ও বৈষম্য; ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। নারীকে অবদমিত রেখে টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা যায়-

– নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন ও দক্ষ হলে তাদের সন্তানরা শিক্ষার আলো পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যায়। পরিবারের আয় বাড়ে। নারীর উপর নির্যাতন,নিপীড়ন

হ্রাস পায়। যৌতুকের দাবী কমে। মোট কথা,শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের মাধ্যমে নারীদের এবং সাথে সাথে তাদের পরিবারের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যত সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে।

– স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা গেলে তারা সুস্থ ও বলিষ্ট সন্তান প্রসব করে থাকে। এতে পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পায়। নারীরা বেশী উৎপাদনক্ষম হয়। তারা পরিবার তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

– নারীদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে পরিবারে এবং সমাজে তাদের মর্যাদা বেড়ে যায়। তারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে। তাদের প্রতি অবিচার ও নির্যাতনের পরিমাণ কমে যায়। নারীর আয় সাধারণত পরিবারের কল্যাণে ব্যয় হয়। তাই নারীর বাড়তি আয়ের মাধ্যমে পরিবারের সার্বিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়ে থাকে।

– নারীরা যদি একতাবদ্ধ ও সংগঠিত হয় তাহলে তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অধিকার আদায়ের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। তাদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আয় বৃদ্ধি করার নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। নারীরা সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে পারিবারিক এবং সামাজিক অনেক সমস্যা সমাধানে তারা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

– পরিবারে ও সমাজের ভিতরে নারী নির্যাতন, নারীর জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। তাই কোন নির্যাতনকে নারীরা বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিবে না, প্রতিটি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ করবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা হবে প্রতিবাদী। সেই সাথে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নারী অধিকার রক্ষায় বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বৈষম্যমূলক আইন সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এতে নারী নির্যাতন কমবে,পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি নিশ্চিত হবে,নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে,মানবাধিকার সংরক্ষণ হবে এবং জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

তাই জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার চেতনাকে ধারণ করে নারী ক্ষমতায়িত, সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত হলেই ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। নারী নেতৃত্ব বিকাশ কার্যক্রম মূলত এই কাজটিই অব্যাহতভাবে করে চলেছে। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ৩ দিনের একটি ফাউন্ডেশন কোর্সের মধ্য দিয়ে নারী নেতৃত্ব বিকাশ কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। কার্যক্রমের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সারাদেশের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বলিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়ী নারী এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে। যারা স্থানীয় পর্যায়ে 'নারীনেত্রী' হিসাবে স্বীকৃত।

ফাউন্ডেশন কোর্স পরবর্তী প্রতি মাসে দিনব্যপী ফলোআপ কর্মশালার মাধ্যমে নেত্রীদের সক্রিয়তা, নেতৃত্বের দক্ষতা ও সামর্থ্য বিকাশের নিয়মিত ও ধারাবাহিক উদ্যোগ চলতে থাকে বছরব্যাপী। একইসাথে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নারী নেত্রীদের মধ্যে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তীব্র হতে থাকে এবং গড়ে উঠে গভীর আন্ত:সম্পর্ক। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ এপ্রিল ২০০৭ এ সাড়াদেশের নারীনেত্রীরা প্রথম জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। আর সম্মেলনের মধ্য দিয়েই এই নেটওয়ার্কের আত্নপ্রকাশ ঘটে ।

তথ্য:bikoshitonari.net

◆ নারীবাদী গবেষণায় প্রভাবিত হয়ে বেশ কিছু সংগঠন নারী আন্দোলন ত্বরান্বিত করেছে। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিক থেকে মহিলা পরিষদ নারীর সমস্যা ও স্বার্থ নিয়ে কাজ করে চলেছে। অধিকন্তু ১৯৮০ সাল থেকে বেশ কিছু সংগঠন নারী উন্নয়নের কর্মকান্ডে যোগ দেয়। এদের মধ্যে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, মহিলা আইনজীবী সমিতি, নারীপক্ষ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নিজেরা করি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, আমরাও পারি, নারী প্রগতি সংঘ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রতিষ্ঠান নারীর অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে, অসমতা বিলোপের জন্য আন্দোলন করে এবং নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রতিহত করে।
তথ্যসূত্র:https://bn.banglapedia.org/

☑কিছু বাংলাদেশী নারীবাদী নারী:

• কামিনী রায় ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম অনার্স সম্পন্ন করা নারী।

• নুরুননাহার ফয়জননেসা বাংলাদেশনারীবাদ আন্দোলনের নেতা ছিলেন

• সুলতানা কামাল একজন বাংলাদেশী আইনজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী। তিনি নাগরিক অধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন।

• রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম নারীবিদ হিসাবে সুপরিচিত।

• সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ বাংলাদেশের প্রথম নারী সংসদ সদস্য হিসাবে নিবাচিত হয়।

• শিরীন শারমিন চৌধুরী বাংলাদেশের প্রথম নারী জাতীয় সংসদীয় স্পিকার ।

• তসলিমা নাসরিন একজন নারীবাদী যিনি ধর্মীয় সমালোচনার জন্য পরিচিত হন।

• হাসনা বেগম সমকালীন বাংলাদেশী দার্শনিক ও নারীবাদী এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক সম্মানিত রোকেয়া চেয়ারের দায়িত্ব পরিচালনা করেছেন।

• রোকেয়া রহমান কবির একজন নারী মুক্তির কর্মী ছিলেন।

• মাসুদা খাতুন ছিলেন একজন অগ্রণী নারীবাদী, যাকে কাজী নজরুল ইসলাম অগ্নি নাগিনী (আগুনের সর্প) নাম দিয়েছিলেন।

📌বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সবস্তরে নারীপূরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন। 📌 (তথ্য:উইকিপিডিয়া)

💗 আর অথচ ইসলাম নারীর অধিকার দিয়েছে আরো ১৪৫০ বছর আগে।এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে নারীবাদ ও ইসলাম প্রবন্ধে ইন শা আল্লাহ।

এখন আসি আমরা নারীবাদ এর প্রকারভেদে:

Feminism বা নারীবাদ” -এর প্রকারভেদ

১. Liberal or, Reformist Feminism

Political, Economic, Social, Educational এসবের ক্ষেত্রে যারা এর কথা বলেন তাদেরকে, Liberal or, Reformist নারীবাদী বলা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার এই ধরণের নারীদের ভালোও লাগে। কারণ এরা যেটাই চায় সেটা “Legal Reform” -এর মধ্যে দিয়ে চায়।

২. Radical or, Extremist Feminism

এক্সট্রিম যাই হোক না কেন সেটা সুবিধার হয় না। এরা অনেকটা খতরনাকও বটে। মানে এদের মধ্যে আছে,

ক. Militant: চিন্তায় এরা সবসময় প্রস্তুত।

খ. Revolutionist: এরা যে কোনো রিফর্মের ক্ষেত্রে বিপ্লবে নামতে রাজী থাকে।

যাইহোক, এই ভাগ আবার আগেরটার থেকে উল্টো। সোজা বাংলায় এরা পিতৃতন্ত্র চায় না। এরা বিপ্লব চায়। এদের কথা অনেকটা এরকম (রেগে যাবেন না প্লিজ!), একজন নারী বাচ্চা নিতে পারলে একজন পুরুষ কেন নিতে পারবে না! (মানে তাদেরও ব্যাথাটা বুঝা উচিত) ।

গ. Marxist/Materialist/Socialist Feminism

মার্কস্ কে না বুঝলে এই ধরণের ফেমিনিস্ট দের বুঝা মুশকিল। এরা ক্লাস বিভাজন নিয়ে কথা বলেন। আপনি যদি “A Room of One's Own” (সেপ্টেম্বর ১৯২৯) by “Virginia Woolf” পড়ে থাকলে আপনি এই ধরণের ফেমিনিস্ট সম্পর্কে ভালো ধারণা পাবেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, একজন নারীর এতটুকু অর্থ থাকা উচিত যাতে তিনি একটা নিজের রুম তৈরি করতে পারেন এবং নিজের মত করে চলতে পারেন।

ঘ. Cultural Feminism/Black Feminism

সংস্কৃতি এবং সাদা ও কালো বর্ণের নারীদের মধ্যে বিভেদ করা যাবেনা। সংস্কৃতি যাই হোক না কেন কোন ভেদাভেদ থাকা যাবে না। গায়ের রঙ যাই হোক না কেন রেসিজম এনে ভেদাভেদ করা উচিত নয় এই মুভমেন্ট সব নারীদের জন্য।
তথ্যসূত্র:https://m.somewhereinblog.net/

মোদ্দা কথা হলো :

আমরা মূলত চার ধরনের নারীবাদ দেখতে পাই।

• উদারপন্থী নারীবাদ

• রেডিক্যাল নারীবাদ

• মার্কসীয় নারীবাদ

• সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ

অল্পকথায়,

উদারপন্থী নারীবাদ নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সমাজে নারী- পুরুষের সমতার কথা বলে। কিন্তু এরা চরমপন্থী নয়।

মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের মতে, নারীদের পুরুষের অধ:স্তন করে রাখা যাবে না। নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলে এরা। এদের মতে, নারী ও পুরুষের আলাদা বা স্বতন্ত্র গুণ আছে। বিশেষ করে নারীদের গুণগুলো বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে।

রেডিক্যাল নারীবাদ চরমপন্থী নারীবাদ। এখানে নারী ও পুরুষকে পৃথক করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। এরা পুরুষবর্জিত নারীবাদের কথা বলে। এরা পুরুষদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। এরা নিজেদের পারিবারিক সম্পর্কগুলোকেও মেনে নিতে পারে না।

নারীবাদের বিভিন্ন ওয়েব বা তরঙ্গ

নারীবাদের ওয়েভ বা তরঙ্গ ৪ টি।যা মূলত ৪টি আলাদা সময়কাল এবং সেই সময়ে বিশ্বব্যাপী নারীদের বিভিন্ন দাবিকে বোঝায়।

১ম তরঙ্গ (১৯০০-১৯৫৯):

নারীবাদ আন্দোলনের প্রথম ঢেউ আসে উনিশ শতকের শেষের দিকে। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল নারীর ভোটের অধিকার। নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ঢেউয়ে যদিও সুসান ব্রাউনমিলার ও এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টনের নামই প্রথমে আসে তবে ইডা বি ওয়েলস, এলেন ওয়াটকিন্স হার্পার এবং সোজার্নার ট্রুথসহ আরো অনেকেরই এ আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা রয়েছে।

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গে আন্দোলন আসলে দু'রকম ছিল। এখানে শ্বেতাঙ্গ নারীরা লড়াই করছিলেন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সমান অধিকার পাবার লক্ষ্যে। ভোটের পাশাপাশি শিক্ষা, পেশা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে গর্ভপাতের অধিকার পর্যন্ত এ আন্দোলনের মূখ্য দাবি ছিল। অন্য দিকে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের লড়াই ছিলো বর্ণ বৈষম্য ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

তাই বলা যায়, নারীর ভোটাধিকারের পাশাপাশি নারী প্রতি বর্ণ বৈষম্য দূর করা এবং সম্পত্তির অধিকার ছিল এ আন্দোলনের প্রধান দাবি।

২য় তরঙ্গ ১৯৬০-১৯৮০:

এ সময়ের প্রধান দাবি ছিলো পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ।এ পর্যায়ে আন্দোলনের মূল দাবি ছিলো নারীর বেতন সমতা, যৌনতার অধিকার, প্রজনন অধিকার, বৈবাহিক ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলা। নারীবাদ আন্দোলনের প্রথম ঢেউয়ে যেমন অনেক দাবিই আইন প্রণয়ন এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয়েছিল, দ্বিতীয় তরঙ্গের বেলাতেও অনেকটাই তাই। লৈঙ্গিক বৈষম্যের পাশাপাশি নারীর প্রতি জাতিগত

ও বর্ণগত যে বৈষম্য ও বিভাজন ছিলো সে ব্যাপারেও আন্দোলন করা হয় এ পর্যায়ে। এর আগ পর্যন্ত নারী আন্দোলনে নারীর প্রতি শ্রেণি এবং জাতিগত বিভাজনকে গৌণ চোখে দেখা হতো। নারীবাদের প্রথম ঢেউয়ের পর শ্বেতাঙ্গ নারী ও পুরুষের মাঝের বৈষম্য কিছুটা কমলেও শ্বেতাঙ্গ নারী ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীতে বিভেদ রয়েই গিয়েছিল। শুধুমাত্র গায়ের রঙয়ের বৈষম্যের কারণে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা এমন অনেক সুবিধা বঞ্চিত ছিলেন যা শ্বেতাঙ্গ নারীরা উপভোগ করতেন।

এইবার আন্দোলনের অর্জনগুলো ছিল:

- সমান বেতন আইন, **১৯৬৩**

- বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন

- শিক্ষার সমানাধিকার (টাইটেল ৯)

- **১৯৭৩** সালে Roe v. Wade কেস দ্বারা নারীর প্রজননের স্বাধীনতা অর্জন

- নিজ নামে ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি

৩য় তরঙ্গ (১৯৯০-২০০০):

এ সময়ের প্রধান দাবি ছিলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন।**১৯৯০** এর দশকের মাঝামাঝি থেকে নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। নারীকে নতুন আঙ্গিকে দেখা, নারীর ভিন্নতাকে মেনে নেয়া, চ্যালেঞ্জ করাই এই পর্যায়ে নারীবাদ আন্দোলনের ঢেউয়ের মূল বক্তব্য ছিলো। উত্তর আধুনিক আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা নতুন করে নারীত্ব, সৌন্দর্য, যৌনতা, পুরুষত্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করেন।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারীকে নতুন রূপে দেখা শুরু হয় এ সময়ে। এ সময়ের নারীবাদীরা পুরোনো অনেক স্টেরিওটাইপ নারীবাদী তত্ত্বকেও প্রত্যাখ্যান করেন। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ থেকে তৃতীয় তরঙ্গের মূল পার্থক্য হলো এ সময়ে ইন্টারসেকশানল ফেমিনিজম বা আন্তঃবিভাজন নারীবাদ তত্ত্বের বিকাশ শুরু হয়। ইন্টারসেকশনালিটি শব্দটি আইনজীবী কিম্বার্লে ক্রেনশ চালু করেছিলেন যা নারীর অধিকার কীভাবে বর্ণ ধর্ম ও জাতিগত পার্থক্যের কারণে বিভাজিত হয় তা ব্যাখ্যা করে।

৪র্থ তরঙ্গ (২০০০-বর্তমান):

এ সময়ের প্রধান দাবি ছিল যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন এবং নারীবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে ২০১২ সালে।ধরে নিতে পারি নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ এখনো চলমান।

এক কথায় বলতে গেলে নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গের মূল হলো নারীর ক্ষমতায়ন।

এ পর্যায়ে রয়েছে নানামুখী আন্দোলন যেমন "মি টু" আন্দোলন। আগের প্রচলিত ধরা-বাঁধা নিয়ম নীতি ভেঙে আবার নতুন নিয়মের কথা বলা হচ্ছে এ পর্যায়ে। যে কোনো অপমান, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে নারীকে নিজের কথা নিজেকে প্রতিবাদের সুরে বলতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। পুরুষের আধিপত্য ভেঙে লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ তৈরির যে স্বপ্ন নারীবাদীরা দেখেন, চতুর্থ ঢেউয়ে সে স্বপ্নই নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। আর এই তরঙ্গের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো অনলাইনে নারীবাদী আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়া, নারীবাদীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমর্থন, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

বিশেষত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বডিশেমিং থেকে শুরু করে যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদের উপর জোর দেয়াই নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:https://feministfactor.com/8709/

📌কিন্তু সকল তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে নারীবাদের উদ্দেশ্য একটাই, স্বাধীনতা ও লিঙ্গ সমতা।📌

নারীবাদের সাথে আরো একটা বিশেষ বিষয় জেনে রাখা বিশেষ ভাবে জরুরী,তা হল LGBT.আসুন এবার জেনে নেই বিষয় টা কি....

LGBT:

বাংলাদেশে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের কার্যক্রম শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে। পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে নানান আঙ্গিকে কাজ কর্ম চলছে।এই ছদ্মনাম নাম ব্যবহার করে যাতে অসচেতন মানুষ কে ধোকা দিয়ে ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এসব কাজ করানো যায়। এসব ইয়াহুদী নাসারাদের ষড়যন্ত্র যাতে লূত (আ:) কওমের মত আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের আল্লাহর ক্রোধের মধ্য ফেলার জন্য।
এলজিবিটি (বা জিএলবিটি) (ইংরেজি: LGBT বা GLBT) একটি নাম-আদ্যক্ষর। ১৯৯০-এর দশক থেকে এই আদ্যক্ষরটি পূর্বতন "গে কমিউনিটি"-র সংজ্ঞাবাচক নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সামগ্রিকভাবে "এলজিবিটি" বলতে বোঝায়

L= "লেসবিয়ান,

G=গে,

B=বাইসেক্সুয়াল ও

T-ট্রান্সজেন্ডার" অর্থাৎ, নারী ও পুরুষ সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী।

LGBT এর সাথে এখন Q যুক্ত হয়েছে এর অর্থ বুঝার কোশ্চেনারী,মানে সে পুরুষ না মহিলা অনিশ্চিত। সোজা কথা এল জি বি টি মানেই হচ্ছে যে সমকামিতা টাকে প্রমোট করা ,যেমন ধরেন একজন মহিলা সে নিজেকে পুরুষ মনে করছে। সে পুরুষ মনে করে সে তার লিঙ্গ চেঞ্জ করে সে একজন পুরুষ হয়েছে এটা নাকি তার অধিকার,তারপর সে একজন মহিলার সাথেই যৌন সঙ্গম করে,সোজা বাংলায় লূত (আ:) জাতির মত নিকৃষ্ট কাজ করছে।আল্লাহ সুবহানওতায়ালা যাদেরকে শাস্তি হিসেবে ধ্বংস করে দিয়েছেন।
কোরআনে সূরা আন নামল এর ৫৪-৫৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সুবহানওতায়ালা ইরশাদ করেন:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ

স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ(আয়াত:৫৪)

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়(আয়াত:৫৫)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়।(আয়াত :৫৬)
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ

অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম।(আয়াত:৫৭)

শুধু কোরআন এ না হাদীসে সমকামিতার ব্যাপারে কঠিন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে:
আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন: "যদি কোন মহিলার উপর কোন মহিলার উপবিষ্ট হয়, তবে তারা উভয়ই ব্যভিচারীনী, যদি কোনও পুরুষ কোন পুরুষের উপরে উপবিষ্ট হয় তবে তারা উভয়ই ব্যভিচারী।"

—আল-তাবারানী (আল-মু'আযাম আল-আওয়াত): ৪১৫৭, আল-বায়হাকী, সু'আব আল-ইমান: ৫০৭৫

আরো অনেক হাদীস আছে,যেহেতু এটা আলোচনার বিষয় না সেজন্য অন্য আলোচনায় আরো বিস্তারিত জানব ইন শা আল্লাহ।
আমাদের দেশে যেভাবে শুরু হয়েছিল এই মহামারী সমকামিতা:

বাংলাদেশে যতো ধরনের এলজিবিটি কর্মকান্ড হয়েছে সবগুলোর মধ্যে নিচের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে –

বিদেশী কানেকশনঃ বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলঃ

• পশ্চিমা ফান্ডিং

• আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও

• আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক

• দেশীয় এনজিও

শব্দজাদুঃ বাংলাদেশে সরাসরি এলজিবিটি বা সমকামী শব্দটা ব্যবহার করে কাজ করা কঠিন তাই এখানে শুরু থেকে কাজ হয়েছে বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ, পরিভাষা এবং অ্যাক্রোনিমের (একাধিক শব্দের একত্রিত সংক্ষিপ্ত রূপ) আড়ালে। যেমন,

• যৌন স্বাস্থ্য,

• MSM (Men Who Have Sex With Men/ এমন পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়)

• Gender Identity (মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)

• SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights/যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার)

• SOGI (sexual orientation (যৌন রুচি), gender identity/মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)

• SOGISEC (sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristic)

• যৌন সংখ্যালঘু

• যৌন অধিকার

• যৌন বৈচিত্র্য

• বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়

• CSE (Comprehensive Sexuality Education/যৌনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষা)

• ট্র্যান্সজেন্ডার (শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ যে নারী সাজে, অথবা শারীরিকভাবে সুস্থ নারী যে পুরুষ সাজে)

বিদ্র:

ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়া কিন্তু এক জিনিস না ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে যারা নিজেরা নিজেদের থেকেই পুরুষ থেকে মহিলা হয় মহিলা থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী আর হিজড়ারা হচ্ছে তারা এভাবেই জন্মগ্রহণ করেন, উনাদেরকে যৌন প্রতিবন্ধী বলা যেতে পারে।কিছু হিজড়া তো স্বাভাবিক জীবন যাপন বিবাহ সবই করতে পারেন।অনেকে ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়াদেরকে একত্রিত করে ফেলেন এবং এটাকেই একত্রিত করে খুব স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন,দুইটা কিন্তুকিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা একটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা থেকে আসে কিন্তু ত্রুটিযুক্ত(হিজড়া) আর আরেকটা হচ্ছে নিজে থেকে একটা সৃষ্টিকে বিকৃত করা(ট্রান্সজেন্ডার)।

পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি

বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের কৌশল হল ধাপে ধাপে আগানো। প্রতি ধাপে তাঁরা নীতিনির্ধারক এবং আমলাদের ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত বা প্রভাবিত করে। এ পদক্ষেপগুলো এমন যে আলাদাভাবে খুব একটা চোখে পড়ার মতো না, কিন্তু দিন শেষে ধাপে ধাপে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়।

মিডিয়া, সুশীল সমাজ, বামপন্থী: মোটামুটি শুরু থেকে বাংলাদেশের মিডিয়া, সুশীল সমাজ এবং বামপন্থীরা এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে সক্রিয় বা সহযোগী হিসেবে কাজ করে গেছে। প্রথমে ব্যাপারটা একটু অদ্ভূত মনে হতে পারে। আদর্শিকভাবে, কিংবা অন্তত মুখ রক্ষার জন্য হলেও এলজিবিটি আন্দোলনের মতো একটা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের বিরোধিতা বাংলাদেশের

বামপন্থীদের করা উচিৎ ছিল। তারা সেটা করেনি, উলটো সহযোগী হয়েছে। একটু খতিয়ে দেখলে এ ব্যাপারটাকে আর অদ্ভূত মনে হয় না।

এলজিবিটি এজেন্ডার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বৈশ্বিক এনজিও নেটওয়ার্ক। আর বাংলাদেশের সুশীল, প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের বড় একটা অংশ যেহেতু এনজিও-জীবি, তাই বিরোধিতার কোন ইচ্ছা থেকে থাকলেও তা ডলারের প্রকোপে মুছে গেছে। এছাড়া প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিশ্বাসগত বা আকীদাহগতভাবেই পশ্চিম থেকে আসা যেকোন মতবাদকে বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে গ্রহণ করে নেয়। ক্রিটিকালি যাচাই করে না।

চার পর্যায়ঃ

আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাসকে আমি চার পর্যায়ে ভাগ করেছি।

- প্রথম পর্যায়: 'এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য'

- দ্বিতীয় পর্যায়: 'গবেষনা এবং যৌন অধিকার, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য'

- তৃতীয় পর্যায়: সমকামী অধিকার

- চতুর্থ পর্যায়: যৌন শিক্ষা ও ট্র্যান্সজেন্ডার

আপাতভাবে পার্থক্য থাকলেও এই সব কথাবার্তার মূল বক্তব্য একঃ অবাধ ও বিকৃত যৌনতা এবং ইচ্ছেমতো নিজের পরিচয় বেছে নেয়ার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ। প্রথম দেখায় অনেক জটিল মনে হলেও এগুলো সহজে বোঝার একটা উপায় আছে।

যখনই এধরনের আলোচনায় 'অধিকার' শব্দটা আসবে, বুঝবেন এখানে বিকৃত যৌনকর্মের বৈধতা দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। যেমন,

- যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার = বিকৃত যৌনতার অধিকার

যখনই, 'বৈচিত্র্য' শব্দটা আসবে, বুঝবেন এখানে বিকৃতির কথা বলা হচ্ছে। যেমন,

• বৈচিত্রময় যৌন পরিচয় = সমকামী বা উভকামী

• বৈচিত্রময় যৌন রুচি = বিকৃত যৌনতা

• বৈচিত্রময় লিঙ্গ পরিচয় = নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারী

তথ্যসূত্র://assalammedia.com/lgbt/

বাংলাদেশে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের প্রথম দশ বছর কাজক্রম চলে ‘এইডস প্রতিরোধ’ আর ‘যৌন স্বাস্থ্য সেবা’র ব্যানারে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৬/০৭ এর দিকে। এ সময় থেকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি সমকামীদের ‘যৌন সংখ্যালঘু’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ‘যৌন অধিকার’ এর দাবি নিয়ে আলাপ তৈরি করা হয়। বলা বাহুল্য এখানে অধিকার দেয়া বলতে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ এবং বৈধতার কথা বলা হচ্ছে।

যৌন স্বাস্থ্য এবং এইডস সচেতনতার ব্যানার থেকে বের করে এনে বিকৃত যৌনতার প্রশ্নকে অধিকারের আলাপ হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ব্র্যাক। বিশেষ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ। Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh, শিরোনামের নিবন্ধে গবেষক আদনান হোসেইন মন্তব্য করেছেন,

"সেবা প্রদানের মডেল থেকে সরে এসে যৌন অধিকারের ব্যাপারে জনপরিসরে আলাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রনী ভূমিকা রাখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর প্রচেষ্টাগুলো।"

☑বিদ্র:আমাদের সবার সচেতনতার জন্য যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন মূল প্রতিবেদনটি খুটিয়ে খুটিয়ে পড়েন,আর অন্যদের ও সচেতন করুন☑

◆বাংলাদেশে প্রথম এলজিবিটি সংক্রান্ত জনসচেতনতা গড়ে তোলার প্রকাশ্য প্রয়াস শুরু হয় ১৯৯৯ সালে যখন রেংগ্যু নামক এক কানাডীয় নাগরিক (যিনি জাতিগতভাবে একজন চাকমা) বাংলাদেশের সমকামীদের জন্য প্রথম অনলাইন গ্রুপ "গে বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠা করেন।এর

সদস্য সংখ্যা একহাজার পর্যন্ত হয়েছিল, কিন্তু রেংগুর মৃত্যুর পরে এর কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসে। এরপর ২০০২ সালে ইয়াহু পোর্টালে প্রকাশ এবং আবরার দ্বারা পরিচালিত টিন গে বাংলাদেশ এবং কাজি হক দ্বারা পরিচালিত বয়েস অব বাংলাদেশ নামক দুইটি অনলাইন গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হয়। ইয়াহু কর্তৃপক্ষ দুইটি গ্রুপই ২০০২ সালে মুছে ফেলে। বিভিন্ন ভাবে নাম পরিবর্তন ও বারবার চালু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত বয়েজ অনলি বাংলাদেশ যা বর্তমানে "বয়েজ অব বাংলাদেশ" নামে পরিচিত এই গ্রুপটিই টিকে আছে। বর্তমানে তানভির আলম নামে পরিচালিত গ্রুপটি বাংলাদেশী সমকামীদের সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক।এটি ২০০৯ থেকে ঢাকায় এলজিবিটি সচেতনতাবর্ধক অনুষ্ঠান করে আসছে। এই দলটি বাংলাদেশে একটি সুসংহত এলজিবিটি সমাজ গড়তে চায়, এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারাটির প্রযোজ্যতার অবসান চায়।৩৭৭ ধারাটি হচ্ছে বাংলাদেশে সমকামিতা অবৈধ।

কিন্তু ১৯৯০ দশকের গোড়ার দিকে ঢাকার কাকরাইলে বন্ধু নামে একটি বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী সংস্থা স্থাপিত হয় যা প্রথম থেকেই পুরুষ সমকামীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে বন্ধু'র শাখা দপ্তর স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থাটি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় এর কার্যক্ষেত্র প্রকাশ্য ও ক্রম প্রসারমান।

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে, বাংলাদেশের প্রথম এলজিবিটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। প্রেমের প্রতিনিধিত্ব করে, এরূপ লোককাহিনী "রূপবান" থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সাময়িকীটির নামকরণ করা হয় *রূপবান* সাময়িকী।

১৪ এপ্রিল বাঙালি নববর্ষ হওয়ায়, এদিনটি বাংলাদেশে শোভাযাত্রাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। ২০১৪ সালে এ দিনটিতে "রেইনবো র‍্যালি" (রঙধনু শোভাযাত্রা) ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। হুমকির পর ২০১৬ সালে এধরনের শোভাযাত্রা বাতিল করা হয়। ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল *রূপবান (ম্যাগাজিন)* প্রতিষ্ঠাতা এবং রেইনবো র‍্যালির সংগঠক জুলহাজ মান্নান বন্ধুসহ খুন হন।

(পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রায় বাংলাদেশের এলজিবিটি অধিকার শোভাযাত্রা (২০১৫)।)

অসংখ্য মানুষ বয়েজ অব বাংলাদেশের (বব) কাছে তাদের সমস্যার কথা বিশদভাবে বলতে থাকে। এই ফোরাম কখনোই নিজেদের সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন করে নি, কারণ তারা নিজেদের নিছক পুরুষ-পুরুষ যৌনক্রিয়া করতে উৎসাহিত করে, এরুপ উপাধি পেতে চায়নি। এই

দলটির সমন্বয়কারী মনে করেন, তাদের কাজের পরিধি আরো ব্যাপক।অনলাইনে সক্রিয় এই দলটি সমকামী পুরুষদের সাক্ষাৎ করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, এবং তাদের মধ্যে সামাজিকীকরণ বৃদ্ধিতে কাজ করে। ববে নিবন্ধিত সদস্যসংখ্যা ২০০০ এর বেশি এবং তাদের মধ্যে পিএইচডিধারী ও চিকিৎসকরাও আছেন।আল্লাহ সুবহানওতায়ালা এসব সংস্থাগুলোকে সমূলে ধ্বংস করুক।আর আমাদেরকেও বেশি থেকে বেশি দ্বীনি ইলম অর্জনের মাধ্যমে আরো সচেতন করে তুলুক,যাতে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি ইন শা আল্লাহ।

নারীবাদ যেমন আমাদের ইসলামী সমাজব্যবস্হার সাথে সাংঘর্ষিক তেমনি এল জি বি টি ও আমাদের সমাজের জন্য আরও ভয়াবহ, তাই এসব ব্যাপারে আমাদের ভাল করে জেনে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে ইন শা আল্লাহ।

নারীবাদ ও ইসলাম:

এ অধ্যায়ে আমারা জানব ইসলামে নারীর অধিকার এবং নারীবাদীদের দাবীগুলো যে কতটা লেইম তা আমরা ইসলামের আলোকে জানার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ।
শুরুতেই আমরা ঘুরে আসি জাহিলীযুগে,যাতে করে ইসলামের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি।।।

জাহিলীযুগে নারীর অবস্থা

জীবন্ত কন্যাসন্তানকে দাফন:

ইসলাম-পূর্ব যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহেলী যুগ, যা বিশেষভাবে আরববাসী এবং সাধারণভাবে পুরো জগতবাসী যাপন করছিল, কারণ সেটা ছিল রাসূলদের বিরতি ও পূর্বের হিদায়াত বিস্মৃতির যুগ। হাদীসের ভাষা মতে “আল্লাহ তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং আরব ও অনারব সবার

ওপর তিনি গোস্বা করলেন, তবে অবশিষ্ট কতক আহলে কিতাব ব্যতীত"।এ সময় নারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ও সাধারণভাবে খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন ছিল। বিশেষত আরব সমাজে। আরবরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপছন্দ করত। তাদের কেউ মেয়েকে জ্যান্ত দাফন করত যেন মাটির নিচে তার মৃত্যু ঘটে। আবার কেউ অসম্মান ও লাঞ্ছনার জীবন-যাপনে মেয়েকে বাধ্য করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٥٩﴾ [النحل[٥٨، ٥٩ :

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হত, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখ, তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ"! [সূরা আন-নাহল, আয়াত: (৫৮-৫৯]

অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ٩﴾ [التكوير[٨، ٩ :

"আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে"? [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ৮-৯]

'মাওউদাতু' সে মেয়েকে বলা হয়, যাকে জীবিত দাফন করা হয় যেন মাটির নীচে মারা যায়। কোনো কন্যা যদিও জ্যান্ত দাফন থেকে নিষ্কৃতি পেত, কিন্তু লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পেত না। নারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পদ যদিও প্রচুর হত, কিন্তু তার মৃত্যুর পর নারী কখনো মিরাসের অধিকারী হত না, যদিও সে হত অভাবী ও খুব সংকটাপন্ন! কারণ তাদের নিকট পুরুষদের জন্য মিরাস খাস ছিল, নারীদের তাতে কোনো অংশ ছিল না, বরং নারীরা মৃত স্বামীর সম্পদের ন্যায় মিরাসে পরিণত হত। ফলশ্রুতিতে এক পুরুষের অধীন অনেক নারী আবদ্ধ হত, যার নির্ধারিত কোনো সংখ্যা ছিল না। একাধিক সপত্নী বা সতীন থাকার কারণে নারীরা যে সংকীর্ণতা, যুলম ও কোণঠাসা অবস্থার সম্মুখীন হত -তা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব।

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৭/৫১১৩

কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদে পিতার অন্তরে যে কুপ্রভাব সৃষ্টি হত, তারই সংবাদভাষ্য কুরআনুল কারীমে তুলে ধরে ইরশাদ হয়েছে :

কুরআনুল কারীমে আরো সংক্ষেপে অন্য আয়াতে বিষয়টি এই ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে :
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

'অথচ তাদের কাউকে যখন তার (কন্যাসন্তান জন্মের) সুসংবাদ দেয়া হয়, যাকে তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে রেখেছে, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায়।' (সূরা যুখরূফ : আয়াত -১৭)

একদিকে ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা আখ্যা দিত জাহেলীরা। অর্থাৎ 'পবিত্র দেবতা'র আকীদা ছিল তাদের মাঝে বিদ্যমান। অপর দিকে তাদের প্রত্যেকেই কন্যাসন্তানের পিতা হওয়াকে অবমাননাকর, অসম্মানজনক ভেবে এই অবমাননা ও অসম্মানকে নিজেদের জন্য সহনীয় মেনে নিতে তারা কখনই প্রস্তুত ছিল না। তাদের এই দ্বিমুখী নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন :
أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

'তোমাদের প্রতিপালক পুত্রসন্তান দেয়ার জন্য তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন আর নিজের জন্য বুঝি ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? প্রকৃতপক্ষে তোমরা গুরুতর কথা বলছ।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৪০)

এ বিষয়টিকে সংবাদের ঢঙে এই ভাষ্যে ইরশাদ করেছেন

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ

: 'তারা তো আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান স্থির করছে। সুবহানাল্লাহ! অথচ নিজেদের জন্য (প্রার্থনা করে) তাই (অর্থাৎ পুত্র সন্তান) যা তাদের অভিলাষ মোতাবেক হয়।' (সূরা নাহল : আয়াত ৫৭)

সম্ভ্রম মর্যাদা পদদলিত

সহীহ বুখারীর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, জাহেলী যুগে নারীদের বন্ধক রাখার মত নিকৃষ্ট প্রথা চালু ছিল। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাযি.) বলেন, আমি যখন কাআব ইবনে আশরাফের কাছে গেলাম এবং তার কাছে ঋণ হিসেবে শস্য চাইলাম তখন সে বলে- 'কাআব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরা তোমাদের নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখ। তখন সেই (ঋণ প্রত্যাশী লোকেরা) বলল, আমরা কীভাবে আপনার কাছে আমাদের নারীদের বন্ধকস্বরূপ রাখতে পারি? অথচ আপনি আরবদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সুন্দর ব্যক্তিত্ব!' (সহীহ বুখারী : কাআব ইবনে আশরাফ হত্যা অধ্যায়)

উপরোক্ত ঘটনা থেকেও আঁচ করা যায় সেই যুগের নারীরা কতটাই না নির্যাতিত ছিল। আর তাদের ইজ্জত-আব্রু ও পুতঃপবিত্রতা কতটা মূল্যহীন ছিল!'
তারা দুনিয়ার ধন-সম্পদের জন্য দাস-দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করত।কোরআনে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা সূরা নূরের ৩৩ নাম্বার আয়াতে এই কথাই এরশাদ করেছেন:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যারা বিবাহে সামর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে, অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কারো না। যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।(সূরা আন-নূর :৩৩)

জাহেলি যুগে বিয়ে

জাহেলী যুগেও বিয়ের নাম প্রচলন সবই ছিল কিন্তু তার অবস্থা কী ছিল? বলতে গেলে এর অধিকাংশ পদ্ধতিই ছিল যিনার।
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, জাহেলী যুগে চার পদ্ধতির বিয়ে-শাদীর প্রচলন ছিল।

১. একটি পদ্ধতি তো তাই যা বর্তমান যুগে প্রচলিত রয়েছে।

২. স্বামী নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তোমার ঋতুস্রাবের রক্ত আসা বন্ধ হয়ে গেলে পবিত্রতা অর্জনের পর অমুক ব্যক্তির কাছে চলে যাও। তার থেকে স্বার্থোদ্ধার কর। অর্থাৎ ওই পরপুরুষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হত। আর স্ত্রী ওই পরপুরুষের সঙ্গে ততদিন পর্যন্ত ওই নারী থাকতে থাকে যতদিন পর্যন্ত পরপুরুষ দ্বারা তার গর্ভ প্রকাশ না পায়। এই সময়টায় স্বামী-স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। পরপুরুষের দ্বারা যখন গর্ভ ধারণ কাজ শেষ হয়ে যায় তখন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনোবাসনা জাগলে সে স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হয়। তারা এমনটি করে থাকত একটি মহান সন্তানের প্রত্যাশায়। এটিকে ‘লজ্জাস্থানের বিয়ে’ বলা হত। এটি মূলত সন্তান প্রজননের একটি পদ্ধতি ছিল।

৩. তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল, একজন নারীর কাছে বিভিন্ন পুরুষ আসত এবং তার সঙ্গে কাম চরিতার্থে নিজের মনোবাসনা পূরণ করত। তবে এর সংখ্যা থাকত ১০ এর নিচে। এরপর ওই নারীর গর্ভ প্রকাশ পেয়ে সন্তান প্রসব হত। সন্তান প্রসবের কিছুদিন পর একজন দূত পাঠিয়ে ওই নারী সবাইকে জানিয়ে একত্রিত করত। কেউ একে অস্বীকার করত না। সবাই একত্রিত হওয়ার পর ওই নারী তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলত, তোমরা সবাই তোমাদের কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তোমরা আমার সঙ্গে সহবাস করতে আসতে। এখন আমার একজন সন্তানও হয়েছে। হে অমুক ব্যক্তি! এটি তোমার সন্তান। তুমি তোমার ইচ্ছে মত এর একটি নাম রেখে নাও। এর মাধ্যমে সন্তানটি ওই ব্যক্তির হয়ে যেত, যার নাম নারী উচ্চারণ করেছে। পুরুষের অস্বীকার করার কোন জো থাকত না।
৪. কিছু নারী এমন ছিল যাদের গেইটে পতাকা টানানো থাকত। এরা পেশাধারী বাজারী মহিলা (পতিতা) হিসেবে গণ্য ছিল। যার ইচ্ছে হত তাদের কাছে যেত। তাদের কোন সন্তান জন্ম হলে যিনাকারী সব পুরুষ একত্রিত হত। একজন গণক ডাকানো হত। গণক নিজ বিদ্যা দ্বারা যাচাই-বাছাই করে যার সন্তান হিসেবে ঘোষণা করত, সন্তানটি ওই ব্যক্তিরই হয়ে যেত। ওই ব্যক্তির অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) এই পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করে বলেন, সব অবৈধ পদ্ধতিগুলো হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতিল ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন: 'সত্য নিয়ে যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, তখন তিনি জাহেলী যুগের প্রচলিত বিয়েগুলো বন্ধ করে দেন। একমাত্র ওই বিয়ে পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখেন, যা বর্তমান সময়ে প্রচলিত আছে।' (সহীহ বুখারী : মিসরী ছাপা, বিয়ে অধ্যায়, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬৫)

উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, জাহেলী যুগে নারীদের ইজ্জত- আব্রু, সম্ভ্রম-সম্মান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত প্রাপ্য থেকে ছিল বঞ্চিত। কেননা যে সমাজে স্বামী আপন স্ত্রীদের পরপুরুষ দ্বারা প্রজননের মত ঘৃণ্য অপকর্ম করার জন্য প্রেরণ করে থাকে সে সমাজের নারীদের ইজ্জত-আব্রু মানসম্মান কোন পর্যায়ে গড়িয়ে ছিল তা আঙ্গুল দ্বারা নির্দেশ করে বলতে হয় না। ঘটনাবলী দ্বারা বুঝে আসে যে, পুরুষরা এমনটি ধারণা করে নিয়েছিল, নারীরা মহরের বিনিময়ে তাদের কাছে বিক্রিত হয়ে গেছে। আর এ কারণেই তো স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীরা তার ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে।
তথ্যসূত্র:https://muslimpost.net

আল্লাহু আকবার কতটা নিকৃষ্ট ছিল ইসলাম পূর্ব নারীর অবস্থা।এবার আমরা দেখি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে নারীর সম্মান ও মর্যাদা কোন স্বপ্নের চূড়ান্ত চূড়ায় উন্নীত করা হয়েছে:

ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলাম নারীর অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণায় নারীর যথাযথ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা আমরা কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি রাসূল (সা.)-এর সীরাত অধ্যয়ন থেকে বিস্তারিত জানতে পারি।ইসলাম এমন একটা জীবন ব্যবস্থা যেটা মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে কামনা করে ইসলাম হচ্ছে আমাদের কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এখানে এমন কোন কিছু নাই যেটার বর্ণনা আল্লাহ সুবাহানাতালা দেন নাই এবং এমন কোন জিনিস আল্লাহ সুবহানাতায়ালা দেননি যেটা মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নয়।আল্লাহ সুবহানাতায়ালা নারীকে যা যা প্রয়োজন যত অধিকার প্রয়োজন সব অধিকার আল্লাহ সুবহানওতায়ালা দিয়েছেন পারিবারিক সামাজিক যত ধরনের অধিকার আছে যেখানে যে পরিমাণ দেওয়া প্রয়োজন কোথাও আল্লাহ সুবহানওতায়ালা নারীদেরকে অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী করেছেন কোথাও আল্লাহ সুবহানা তায়ালা পুরুষদের কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।কারণ আল্লাহ সুবহানাতায়ালা জানেন কোন জায়গায় কোন জিনিসে প্রয়োজন এবং তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি নারী-পুরুষ সবাইকে যেইখানে যেই পরিমাণ অধিকার বা মর্যাদা প্রয়োজন সেটাই দিয়েছেন কারণ ইসলাম শুধু কোন ধর্ম নয় ইসলাম একটা সংস্কৃতি মানে আমাদের জীবনে আমাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলতে চলে আমাদের বাথরুম থেকে শুরু হতে শুরু করে বিশ্ব পরিচালনা পর্যন্ত যা প্রয়োজন সবই ইসলামে আছে।ইসলামটা এমন কোন ধর্ম নয় যেটা শুধুমাত্র কিছু রীতি নীতিতে আবদ্ধ ইসলাম হচ্ছে একটা সংস্কৃতি একটা জাতীয়তা একটা আইডেন্টিটি ইসলামের ভিতরে সব কিছু আছে এটা শুধুমাত্র একটা ধর্ম নয়।আমরা ইসলাম নিয়ে জায়গাটাই ভুল করে ফেলি আমরা ইসলামকে শুধু মাত্র কিছু ধর্মীয় রীতি-নীতির ভিতরে সীমাবদ্ধ করে ফেলি কিন্তু এটা শুধুমাত্র ধর্মীয় রীতি-নীতির ভিতরে যদি আমরা সীমাবদ্ধ করে ফেলি তাহলে আমরা কারো কোন অধিকারই সুস্পষ্ট ভাবে দিতে পারব না,অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা আমরা কোনভাবেই এই অধিকার গুলার সমতা বিধানই আমাদের বুঝে আসবে না সেজন্যে আমরা বারবার বলতেই থাকবো অধিকার আদায় হচ্ছে না ন্যায্য অধিকার দিচ্ছে না আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে নারীবাদী সদস্যদের।

⬣আফসোস আমাদের জন্য আমরা এখন নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন করি অথচ সেই ১৫০০ বছর আগেই আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আল কুরআনে সূরা আন নিসা মানে নারী জাতি নামে পূর্ণাঙ্গ একটা সূরা নাযিল করেছেন যে সূরায় আল্লাহ সুবহানাতায়ালা নারীদের অধিকার বর্ণনা করেছেন এমনকি কোন সূরা আপনারা দেখেছেন যেই জায়গায় আল্লাহ সুবহানাতায়ালা পুরুষ জাতি নামে কোন সূরা বর্ণনা করেছেন এবং পুরুষদের অধিকার বর্ণনা করেছেন।পবিত্র কোরআনে 'নিসা' অর্থাৎ 'মহিলা' শব্দটি ৫৭ বার এবং 'ইমরাআহ' অর্থাৎ 'নারী' শব্দটি ২৬

বার উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু ‘নিসা’ তথা ‘মহিলা’ শিরোনামে নারীর অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র ও সুপরিসর সুরাও রয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারীর যত ভূমিকা হতে পারে, ইসলাম সবগুলোতেই নিশ্চিত করেছে নারীর সম্মানে। আলাদা চ্যাপ্টারই দেওয়া হলো কোরআনে- 'অধ্যায়: নারী', সূরা নিসা। এই সূরার প্রথম থেকে ৩৪ নম্বর আয়াত আলোচনা হয়েছে যে বিষয়গুলো নিয়ে তার অধিকাংশই নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিধান,মানে আইন।

• মানবজাতির উৎস হিসেবে নারীর মর্যাদা দিয়ে শুরু। Respect the womb that bore you-এ ধরনের একটা মেসেজ।

• এতীমের ব্যাপারে বিধান

• এতীম মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বিধানা

• বহুবিবাহ সীমিতকরণ, আগে ছিল লাগামছাড়া। এখন লাগাম দেওয়া হলো।

• একবিবাহ উদ্‌বুদ্ধকরণ

• স্ত্রীর মোহর পাবার অধিকার (সিকিউরিটি মানি হিসেবে) ও ভরণপোষণের অধিকার

• নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রবর্তন, আগে কিছুই পেত না।

• নারীর উপর ব্যভিচারের মামলা কঠিন করা হলো যাতে চাইলেই অপবাদ দেওয়া না যায় নারীকে।

• নারী মৃতব্যক্তির সম্পত্তি গণ্য হত। ওয়ারিশ তাকে জোর করে বিয়ে করত বা টাকার বিনিময়ে অন্যত্র বিয়ে দিত। পুরুষ নিজেকে নারীর জানমালের মালিক ভাবত। এটাকে এবং এই মানসিকতা থেকে যত জুলুম হতে পারে সেগুলো হারাম করা হলো।

• কোন কোন নারীকে বিবাহ করা যাবে না সে বিধান দেওয়া হলো। আগে সৎমাকে বিয়ে করার ন্যাক্কারজনক রীতি ছিল।

• এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এসব অধিকার লঙ্ঘন হলে তীব্র শাস্তির হুমকি এবং অধিকার আদায় করলে লোভনীয় অফার দেওয়া হলো।

তথ্যসূত্র:[সূরা নিসা আয়াত:১-৩১ ,ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-২]

🌷 শুধু সূরা নিসায় নয় আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আরও অন্যান্য সূরায় নারী জাতিকে পুরুষজাতির সাথে পুরুষজাতের সহযোগী পরিপূরক এবং একজন আরেকজনের পোশাক এমন অনেক অনেক রূপক অর্থে নারীর অধিকারকে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বারবার বর্ণনা করেছেন যা আমরা বারবার চোখ বন্ধ করে উপেক্ষা করে যাচ্ছি।আল্লাহ সুবহানাতায়ালা কুরআনে কারীমে যেসব অধিকার বর্ণনা করে এরশাদ করেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ﴾ [الحجرات: ١٣]

“হে মানব জাতি, নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নারী পুরুষের সঙ্গী, যেমন সে পুরুষের সঙ্গী নেকি প্রাপ্তি ও শাস্তির ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧]

“যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমরা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব”। [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৯৭]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ﴾ [الاحزاب: ٧٣]

“যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের ‘আযাব দেন। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭৩]

আল্লাহ তা‘আলা মৃত ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় নারীকে পরিত্যক্ত মিরাস গণ্য করা হারাম করেন। যেমন তিনি বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ ﴾ [النساء: ١٩]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিশ হবে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

এভাবে ইসলাম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে তাকে ওয়ারিশ ঘোষণা দেয়। কারণ, সে পরিত্যক্ত সম্পদ নয়। মৃত নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে মিরাসের হক প্রদান করে তাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧﴾ [النساء: ٧]

“পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ, তা কম হোক বা বেশি হোক, নির্ধারিত হারে”।
[সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ ﴾ [النساء: ١١]

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদেরকে ক্ষেত্রে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক ...”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১]

এভাবে আল্লাহ একজন নারীকে মা, মেয়ে, বোন ও স্ত্রী হিসেবে মিরাস দান করেন।
আর বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করেন, শর্ত হচ্ছে নারীদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও তাদের সাথে প্রচলিত রেওয়াজ মোতাবেক আচরণ করতে হবে। তিনি বলেন:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: ١٩]

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে আচরণ কর"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

অধিকন্তু নারীর জন্য পুরুষের ওপর দেন-মোহর অবধারিত করে তাকে তা পরিপূর্ণ প্রদান করার নির্দেশ দেন, তবে নারী যদি স্বেচ্ছায় ও পূর্ণ সন্তুষ্টিতে কিছু হক ত্যাগ করে সেটা পুরুষের জন্য বৈধ। তিনি বলেন:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤﴾ [النساء: ٤]

"আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহ খাও"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪]

ইসলাম নারীকে তার স্বামীর ঘরে আদেশ ও নিষেধকারী জিম্মাদার এবং স্বীয় সন্তানের ওপর কর্তৃত্বকারী অভিভাবক বানিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»

"নারী তার স্বামীর ঘরে জিম্মাদার এবং তার জিম্মাদারি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে"।

রেওয়াজ মোতাবেক নারীর খরচ ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব করেছেন।

এই আয়াতগুলোতে পেলাম

-সৃষ্টিকুলের জন্য নারী ও পুরুষ সমান প্রয়োজনীয়
-নেক ও বদ কাজে নারী ও পুরুষের কাজ অনুযায়ী অংশ
-মিরাস নির্দিষ্ট করেছেন যা ইসলাম পূর্ব যুগে ছিলনা উল্টো তারা নারীকেই মিরাস হিসেবে ভাগ করে নিত সুবহানাল্লাহ।
-মোহরানার অধিকার
এগুলোই শেষ না চলেন আরো আছে.....

(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا-ْ

‘তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ’লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ’তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ’ (নিসা ৩)।

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ’ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ’তে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ ‘হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না’ (বাক্বারাহ ২৩২)।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।
[বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬]

(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' (বাক্বারাহ ১৮৭)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।[তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫২, সনদ ছহীহ।]

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْف 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো' (নিসা ১৯)।

(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে' (নিসা ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ'ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো'। অর্থাৎ 'মোহর'।
[বুখারী ও মুসলিম, বুলূগুল মারাম, হা/৯৮৯]

(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

‘হে রাসূল (স:)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন’ (বাক্বারাহ ২২২)।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর’ (বাক্বারাহ ২২৩)।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ-

জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ’তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ’লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার’ (বাক্বারাহ :২২৩)
তথ্যসূত্র:বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৩; ইবনু মাজাহ হা/১৫৬২।https://at-tahreek.com/article_details/7942

প্রথমত, ক্ষেতের ফসল চাষীর ভবিষ্যতের পাথেয়। ঠিক তেমনই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পুরুষের বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন।

. দ্বিতীয়ত, চাষী শস্যক্ষেত্রের যত্ন নেয়, বীজ বোনে, নিড়ানি দেয়, সার দেয়, সেচ দেয়। ক্ষেতেই তার সারাদিন কাটে। স্ত্রীও তেমনি সারাদিন স্বামীর মনোজগৎ জুড়ে থাকবে। স্বামীও স্ত্রীর যত্ন নেবেন, তার সুযোগসুবিধা রোগশোক এসবের প্রতি খেয়াল রাখবেন।

- তৃতীয়ত, চাষী তার জমি ডিফাইন করে, আইল দেয়- যে 'এটা আমার জমি'। সেখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ সে সহ্য করে না। এর জন্য সে সব করতে প্রস্তুত। মামলা মোকদ্দমা থেকে শুরু করে মারপিট- সব। জীবনদিতেও তৈরি, জীবন নিতেও তৈরি। স্ত্রীও স্বামীর কাছে এমন রত্ন। যেকোন গুলো সে সস্ত্রীকে রাক্ষা করবে। অধিকারবোধের (possessiveness) কারণে স্ত্রীর বিষয়ে কারো হস্তক্ষেপ তার কাছে অসহ্য হবে। 'ও শুধুই আমার' -এই অনুভূতি কাজ করবে স্ত্রীর প্রতি।

ফাইনালি, জমিটুকু চাষীর সম্বল। ওটাই তার দুনিয়া। পরম নির্ভরতা ও আবেগের জায়গা। তার কাছে ঐ জমিটুকুই তার সবকিছু। চাষীর ২৪ ঘণ্টার সব সাধ্য-সাধনা-সুপ্ন-বেদনা তার জমিটুকু ঘিরে। সব ভাবনা-চিন্তা-কল্পনা তার জমির জন্য। স্বামীর কাছে স্ত্রীর মর্যাদা ও আবেদনও এমন। স্ত্রী তার স্বামীর গর্বের ধন, তার আশ্রয়-সম্বল, স্ত্রী স্বামীর কাছে তার দুনিয়া, তার সবকিছু। তার নির্ভরতা, তার কল্পনা-ভাবনা-পরিশ্রমের কেন্দ্র।
রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পের সবচেয়ে জোশ লাইন কোনটা ছিল কে বলতে পারবে'?

- 'সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ', এটা তাই না?

- 'বাহ। সুন্দর মনে আছে দেখছি।

বন্ধুরা, রবীন্দ্রনাথ বললে ঠিক আছে। সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। একই জিনিস আল্লাহ শস্যক্ষেত্রের উপমা দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছেন। এখন এত প্রশ্ন? এই আমাদের বিবেক? ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আর কতকাল?

কুরআন এখনো নতুন, চিরনতুন। ইসলাম তখনো নারীর অধিকার নিয়ে বলেছে, এখনো বলছে; যেটুকু অধিকার পেলে নারী সত্তাগতভাবে ভালো থাকবে। নারীর নারীত্ব ভালো থাকবে।

ইসলামের ডেফিনেশনের বাইরে যদি কেউ অধিকার দিতে চায়, সেটা অধিকার নয়, সেটা ফঁদ। যে ফাঁদে আটকে ছটফট করবে নারীর নারীত্ব। যে নারীত্বের উপর নির্ভর করে পুরোটা সমাজ, পুরোটা ভবিষ্যত।ইসলাম এখনো আধুনিকই আছে শুধু চোখ থেকে উপনিবেশিক মনিবদের চশমাটা সরাতে হবে।

তথ্যসূত্র:ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

(চ)মা হিসেবে নারীর সম্মান :

পৃথিবীতে আল্লাহ ও রাসুলের পর সবচেয়ে বড় মর্যাদাবান গর্ভধারিণী মা। কোরআনে বারবার বলা হয়েছে সে কথা। যেমন আল্লাহ সুবহানওতায়ালা ইরশাদ করেন,
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বলো তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা।' (সুরা বনি ইসরাইল : ২৩)।

হাদিসেও স্পষ্ট করা হয়েছে বিষয়টি। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি নবীজির (সা.) কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসুল, কে আমার সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখেন? নবীজি বললেন, 'তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি আবার বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।' (বুখারি : ৫৯৭১)

(ছ)কন্যা হিসেবে মর্যাদা :

ইসলামপূর্ব যুগে কন্যাসন্তান জন্মকে পাপ মনে করা হতো। কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত পিতা। ইসলাম সে প্রথা উচ্ছেদ করে কন্যা জন্মকে সৌভাগ্যে পরিণত করেছে। এই বর্বরপ্রথা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

'যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।' (সুরা নাহল : ৫৮-৫৯)।

কন্যাসন্তান লালন-পালনে উদ্বুদ্ধ করে বর্ণিত হয়েছে অনেক হাদিস। যেমন- হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি দুটি কন্যার লালন-পালন তাদের সাবালিকা হওয়া অবধি করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এই দুটি আঙুলের মতো পাশাপাশি আসব।' অতঃপর তিনি তাঁর আঙুলগুলো মিলিত করে দেখালেন। (মুসলিম : ২৬৩১)

জ)বোন হিসেবে নারীর সম্মান

ইসলামে আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের যে কারও যদি তিনজন কন্যা বা বোন গঘঞথেঋঔও
সে তাদের সুন্দরমতো দেখাশোনা করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিজি : ১৯১৬)

ঝ)বিধবা নারীর সম্মান :

বিধবারা সমাজে অবহেলিত। ইসলাম তাদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'যারা বিধবা নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজি ও সদা রোজা পালনকারী।' (বুখারি : ৫৩৫৩)।

তথ্যসূত্র:https://www.shomoyeralo.com/

সুবহানাল্লাহ এরকম আরো হাজারো উদাহরণ দেয়া যাবে,চলেন এবার দেখে আসি ভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার কেমন:

বিভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার

হিন্দু ধর্মে :

নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'।[আব্দুল খালেক, নারী (ঢাকা : দীনী পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৯৯), পৃঃ ৪।]

নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।[সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী ওমরী, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, অনুবাদ : মাওলানা কারামত আলী নিজামী (ঢাকা : সালাউদ্দিন বইঘর, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ ইং), পৃঃ ২২।]

বৌদ্ধ ধর্মে :

বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।[Nazhat Afza and khurshid Ahmad, The position of womanin Islam, Kuwait Islamic Book publishers, 1982), p. 9-10.]

ইহুদি ধর্মে :

এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘সতী নারীঐ যার চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল’।[সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩৫]
তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে :

খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে ‘কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ’-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' ‘নারীর কোন আত্মা নেই’।[নারী, পৃঃ ৯।]

চীন সভ্যতায় :
চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, ‘মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই’।[নারী পৃঃ ৫।]

গ্রীক সভ্যতায় :

বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' ‘নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস’।[নারী: পৃঃ ২]

রোম সভ্যতায় :

রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।[ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৩]

☑এই দেখুন ভিন্ন ধর্মে নারীর কি চরম পরিস্থিতি,এসব কারণেই পশ্চিমা বিশ্বে নারীবাদ শুরু হয়েছে,কারণ সেসব দেশে নারীকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করতো না।ইসলাম
শুরু থেকেই নারীর যথার্থ মর্যাদা দিয়ে আসছে তারপরও কেন এত আন্দোলন,এত নারীবাদী চিন্তা চেতনা... এবার
আমরা এর সমাধান খুজি:

ইসলাম দিয়ে নারীবাদীদের দাবী খন্ডন

এই উপমহাদেশে ইসলাম আসার পর আমরা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তার ছায়াতলে এসেছি। বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝে মুষ্টিমেয় মুসলিম ব্যক্তি জীবনে ইসলামকে ধারণ করেছে ঠিকই, কিন্তু পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবনে হিন্দুয়ানি স্বভাব ছাড়তে পারিনি। বরং বংশ-পরম্পরায় সেই মানসিকতা বয়ে চলেছি, শিখিয়েছি সন্তানদের। প্রজন্মে প্রজন্মে আমাদের বিধবারা বাকি জীবন সাদা শাড়ি পরেছে, কন্যা-সন্তানকে হীন নজরে দেখা হয়েছে, পণের নাম হয়েছে যৌতুক, শ্রাদ্ধের নাম হয়েছে কুলখানি-চল্লিশা, প্রতিমাপূজার জায়গা নিয়েছে মাজার বা পঞ্চপির। আমি একে বলি 'হিন্দুয়ানি ইসলাম'। যার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে আমাদের মেয়েরা। ইসলাম যে মর্যাদার, প্রশান্তির, আরামের আর সার্থকতার জীবন নারীকে দিয়েছিল, হিন্দুয়ানি-মুসলিম-সমাজ তা আমাদের নারীদের দিতে পারেনি। মানে দেয়নি। পশ্চিমা-সমাজ কিন্তু নারীবাদের ঝলমলে সোনার খাঁচা ঠিকই তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। আমরা আমাদের নিজ ঘরের মেয়েদের কাছে ইসলামের মুক্তির ডাক পৌঁছতে পারিনি। ফল হিসেবে চোখ ধাঁধানো শিশিরবিন্দুতে ধোঁকা খেয়ে পশ্চিমা মাকড়সার জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ছটফট করছে আমাদের প্রজাপতিরা।আজ আমাদের চোখে সেটে থাকা লেন্সটা পশ্চিমা। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে আমরা যখন ইসলামকে দেখি তখন অনেক-কিছু মেনে নেওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। ইসলামের অনেক-কিছু আমাদের কাছে 'যৌক্তিক', 'আধুনিক' কিংবা 'উপযুক্ত' মনে হয় না।
তথ্যসূত্র: ডাবল স্ট্যান্ডার্ড- ২

নারীবাদীদের মূল দাবি হচ্ছে ২টি নারী মুক্তি বা স্বাধীনতা এবং পুরুষদের সাথে সমতা বিধান এখন চলুন আমরা দেখি স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি বলতে তারা কি বুঝাতে চায়:

১:স্বাধীনতা বলতে হচ্ছে নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি বলতে বোঝায় নারীকে ঘর থেকে বের করে রাস্তায় জাহিলি যুগের মত কর্পোরেট মার্কেটে বের করে দেওয়া,যেখানে নারীকে হতে হবে সুপারউইম্যান ঘরবাহির দুইটা একসাথে সামলাতে হবে। নারীর স্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা, নারীর যোগ্যতা ব্যবহার, নারীর মর্যাদা অর্জন, নারীর সম-অধিকার। প্রতিটা কথার উদ্দেশ্য একটাই। নারী অর্থনীতিতে আসবে, রোজগার করবে, চাকরি করবে।ঘরে সুন্দর করে স্বামী আর সন্তানের দেখাশুনা করা ঘর সুন্দর করে সামলিয়ে রাখা নাকি নারীদের উপর জুলুম করা আর নারীদেরকে রাস্তায় বের করা নাকি নারীর মুক্তি এটাই তাদের ভাষ্য।অথচ রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের জান্নাত লাভের জন্য চারটি সহজ আমলের কথা বলেছেন:

💔হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-- যখন কোনো নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে।- রমজানের রোজা পালন করবে।- নিজের ইজ্জত-আব্রুর (সতীত্বের) হেফাজত করবে এবং- তার স্বামীর আনুগত্য করবে।তখন তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চাও তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।’ (ইবনে মাজাহ)💔

সুবহানাল্লাহ কত বড় কথা জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা সেই দরজা দিয়েই নারী জান্নাতে যেতে পারবে।এবার আমরা দেখি এ স্বাধীনতা আমাদের নারীকে কি দিয়েছে কত শান্তিতে তারা থাকতে পারছে স্বাধীনতা নিয়ে আমরা সেটা একটু খেয়াল করি,না নারী মুক্তি নারী স্বাধীনতা এগুলাই শুধুই ফাঁকা বলি।।।

◆'স্বাধীনতা'র এই ধারণাটা এসেছে ইউরোপ থেকে। আমরা ব্যবহার করি-মুক্তি, বন্দিত্বের বিপরীতে ছাড়া পাওয়া, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ- এই জাতীয় অর্থে। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা যখন কোনো স্বাধীনতার কথা বলে, তখন তারা অভিধানের অর্থে বলে না। বলে পরিভাষাগত অর্থে, তখন এর মধ্যে লুকোনো থাকে গোটা একটা দর্শন।

কীরকম?

পশ্চিমা দর্শনে-

'ব্যক্তি'র (human person) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতা। প্রাণিসত্তাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিসত্তায় যাবার রাস্তা হলো 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা'।

একজন লোক 'ব্যক্তি' হতে পারবে, যখন সে নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত চর্চা করবে। স্বাধীনভাবে নিজের জীবনের গড়ে নেবে এবং জীবন কীভাবে চালাবে সে নির্দেশনা নিজেই স্বাধীনভাবে দেবে।।।

আর স্বাধীনতা হলো-

সে-ই স্বাধীন 'ব্যক্তি' যে নৈতিকতার স্রষ্টা, নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে (creator of values)স্বাধীন ব্যক্তি আগের কোনো মূল্যবোধকে মেনে নেয় না। সে মূল্যবোধ-নৈতিকতা নিজে ঠিক করে।
মানে... সোজা বাংলায় ধর্মের বেঁধে দেওয়া মূল্যবোধের মাপকাঠিকে স্বীকৃতি না দিয়ে, নিজেই নিজের নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে নেবে প্রকৃত 'ব্যক্তি'।'' Values are not recognaized by you, values are determined by you''.

স্বাধীনতা বলতে যে অর্থ, তা বাস্তবে সম্ভব না। কেউ-ই স্ব-ইচ্ছা-অধীন হতে পারি না। পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের সদস্য কোনো-না-কোনো নিয়ম-আইন আমাদেরকে মানতেই হয়। এমনকি, ব্যক্তিজীবনেও আমরা স্বাধীন না। রাষ্ট্রকে দিয়ে, সমাজকে দিয়ে, পরিবারকে দিয়ে আমরা নিয়ন্ত্রিত। আমরা ট্রেন্ড মানতে বাধ্য, ফ্যাশন মানতে বাধ্য, আর্ট-কালচার, কর্পোরেট খেলাধুলা, মিডিয়া, সায়েন্স, ডিগ্রি, টাকা, খ্যাতি, লৌকিকতা, ক্যারিয়ার-এদের দাসত্বে কাটছে আমাদের প্রতিটা দিন। স্বাধীনতা এই শব্দটাই ফাঁপা।যে প্রসঙ্গেই বলুক,
রুশোর কথাটাই বাস্তবে ঘটে: Man is born free, but everywhere he is in chains.

পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। এবং এগুলো সুষ্ঠুভাবে চলতে আইন লাগবে। সোজাসাপ্টা কথা। মানুষের মগজ থেকে আসা, মানুষের বানানো যে-কোনো সিস্টেমে একপক্ষ হয় জালেম, আরেকপক্ষ হয় মজলুম। কারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, শুধু নিজের কথা ভাবে। 'নিজেকে খুশি করা', এই 'নিজ'-কে নিয়ন্ত্রণ না করলে সে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।মানব-রচিত, মানুষের বানানো কোনো-না-কোনো সিস্টেমকে মেনে চলছি আমরা সবাই। দাসত্ব করছি মানুষের।মানব রচিত ব্যবস্থার দাসত্যে আবশ্যিকভাবে কেউ জালেম হচ্ছে কেউ মাজলুম। কেননা প্রত্যেকে মানব রচিত মতবাদে অপূর্ণাঙ্গ।
ইউরোপের ভাষায়, স্বাধীনতা মানে তাই ধর্মের শেকল খুলে ফেলে সৃষ্টির দাসত্ব। লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান। নিজের খেয়ালখুশির দাসত্ব, মানবরচিত মতবাদের দাসত্ব। ফল: হয় তুমি জালেম, না হয় মজলুম। আর, মানুষের গোলামি থেকে আল্লাহর গোলামির দিকে আসার নামই ইসলাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

- 'মানুষের বানানো মাপকাঠির ছেড়ে আল্লাহর দেওয়ামাপকাঠির কাছে সমর্পণ- আত্মসমর্পণ, ইসলাম'।

ইসলাম শুধু ধর্ম না, ইসলাম হলো 'দ্বীন'। দ্বীন এর সবচেয়ে কাছাকাছি অর্থ হলে 'সিস্টেম'।
দ্বীনের অর্থ যদি আমরা 'ধর্ম' ধরি, তা হলে ইসলামের ৯০% আমরা বুঝবো না, বাকি ১০%

জিনিস আংশিক বুঝবো। চরম পার্সোনাল লেভেলের অভ্যাস থেকে শুরু করে পারিবারিক আন্তঃসম্পর্ক, সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক, অর্থব্যবস্থা, বিচারিক সিস্টেম, প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-জীবনের ও দুনিয়ার সবক্ষেত্রে ভিন্ন নীতির সমন্বয়ে একটা হলিস্টিক বা সামগ্রিক সিস্টেম হলো দ্বীন। প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের যতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।নারীরা কি করবে কিভাবে চলবে কোথায় যাবে এগুলোর সম্পর্ক ইসলামে আছে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি।

আল্লাহ সুবহানওতায়ালা কোরআন এ কারীমে ইরশাদ করেছেন:

:وَ قَرۡنَ فِیۡ بُیُوۡتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ الۡجَاهِلِیَّۃِ الۡاُوۡلٰی وَ اَقِمۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتِیۡنَ الزَّكٰوۃَ وَ اَطِعۡنَ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ؕ اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰهُ لِیُذۡهِبَ عَنۡكُمُ الرِّجۡسَ اَهۡلَ الۡبَیۡتِ وَ یُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِیۡرًا ﴿۳۳﴾

و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیۃ الاولی و اقمن الصلوۃ و اتین الزکوۃ و اطعن الله و رسولهٗ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا﴿۳۳﴾

আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।(সূরা আহযাব:৩৩)

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে তার রাইয়ত (অধীনস্থ) দের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।... স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের জিম্মাদার, তাহাকে তার ঘরে বসবাসকারী সন্তান ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।(বুখারী:৮৯৩)

📌আর আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে স্বাধীনতার নামে ঘর ছাড়তে হবে স্বামীর আনুগত্য করা যাবে না অফিসের বসের আনুগত্য করতে হবে খেয়াল করুন আরেকটা হাদিস:

আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. নবিজির দরবারে গিয়ে আরয করেন, নারীদের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আগমন করেছি। (আল্লাহর রাসূল!) আল্লাহ তাআলা আপনাকে নারী ও পুরুষ সবার কাছেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার উপর ও আপনার প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। আমরা নারীরা তো ঘরের কাজ-কর্ম আঞ্জাম দেই। সন্তান গর্ভে ধারণ করি। (তাদের লালন-পালন করি) আমাদের উপর (বিভিন্ন ইবাদাতের ক্ষেত্রে) পুরুষদের ফজিলত রয়েছে। তারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে। রোগী দেখতে যায়। জানাযায়

শরীক হয়। একের পর এক হাজ্জ করে। সবচেয়ে বড়ো ফজিলতের ব্যাপার হল তারা 'আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে। তো আমরা কীভাবে তাদের মত ফজিলত ও সাওয়াব লাভ করতে পারব? নবিজি তখন সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো দ্বীনী বিষয়ে তোমরা কি কোনো নারীকে এর চেয়ে সুন্দর প্রশ্ন করতে শুনেছ কখনও? এরপর নবিজি সে নারীকে লক্ষ করে বললেন, তুমি আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবন কর এবং অন্যান্য মহিলাদেরও একথা জানিয়ে দাও যে, স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা ও তার পছন্দনীয় কাজ করা এসকল আমলের সমতুল্য সাওয়াব ও মর্যাদা রাখে। [শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৮৩৬৯; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৫২০৯]

খেয়াল করুন আরেকটা হাদীস:

উম্মু সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে- কোনো নারী তার স্বামীকে খুশী রেখে মারা যায় সে জান্নাতে যাবে। [তিরমিযি **১১৬১**,যঈফ]

আমাদের দ্বীনের জ্ঞান না থাকার কারণে আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আসলে নারী মুক্তি হচ্ছে ঘরের মধ্যে থেকে ইসলামের রীতিনীতি ফলো করে স্বামীর আনুগত্য করে সন্তানদেরকে দিনের মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা।

২:নারী পুরুষ সমান =

নারী-পুরুষ কোনোভাবেই সমান না। এবং চাকুরির নামে, স্বাবলম্বী হবার নামে, সমানাধিকারের নামে, ক্ষমতায়নের নামে নারীকে জবমার্কেটে এনে এই অতিরিক্ত স্ট্রেসটা নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অফিসে ও বাসায় নারীর দ্বৈত ভূমিকাই তাদের কর্মস্থলে পুরুষের চেয়ে বেশি স্ট্রেস অনুভব করার মূল কারণ।

'মানে যে জিনিস নিয়ে নারীকে আগে স্ট্রেস নিতে হত না, সেই জিনিসগুলো নিয়ে নারীকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, টেনশান করতে হচ্ছে', যে সময় তার শরীর রেস্ট চায়, সে সময় তাকে ৯টা-৫টা কাজ করানো হচ্ছে। সে পুরুষের সমান হবার জন্য করছে। আমি কেন পারব না- এই জেদের কারণে করছে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য করছে। কিন্তু শরীর তো চলে শরীরের নিয়মে'।

জাস্ট ইমাজিন, এই চাকুরি-কেন্দ্রিক স্ট্রেসের কারণে নারীদের হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের সম্ভাবনা ৪০% বেশি।
- 'পুরুষের মাঝে কাজ করতে সে বেশি স্ট্রেস ফীল করে, সেখানেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

নারী কর্মকর্তারা বেশি স্ট্রেস, উদ্‌দ্বেগ ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন,রিসার্চ বলছে।

তথ্যসূত্র://hbr.org/2016/08/why-women-feel-more-stress-at-work

যে দেশে নারীবাদীদের বেশিরভাগ দাবিই পূরণ করেছে, সেই ব্রিটেনের মতো দেশেই ৭৯% নারী কর্মক্ষেত্রের স্ট্রেসে ভুগছেন, ৭৮% নারী কর্মজীবীর ঘুমে সমস্যা, মোটের উপর ৮৭% নারী চাকুরি নিয়ে স্ট্রেসে আছেন বলে জানিয়েছেন।
Women Are at Breaking Point Because of Workplace Stress: Wellbeing Survey Cigna, Louise Chunn, forbes.com [shorturl.at/bMOZ5]

এখন বিজ্ঞানও বলছে নারী পুরুষ সমান নারী এখন পুরুষের যে কোন সেক্টরে পুরুষের পারফরম্যান্স কে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে,কিন্তু এই বিজ্ঞান ই আবার আমাদের সাথে একমত না চলেন দেখে আসি কিছু নমুনা:

নমুনা ১:
উচ্চতায় আমরা ছেলেদের চেয়ে গড়ে ৯% ছোটো, মস্তিষ্কের আয়তন ১১% কম আমাদের, হৃৎপিণ্ড ১৫% কম, লিভার ১২% কম, কিডনি দুটো ১৬% কম, ফুসফুস দুটো ২০% কম্। পুরুষের হাড়ের ওজন (bone man) ৫০% বেশি। উপরাংশে পুরুষের চেয়ে পেশী ৪০% কম, নিচের অংশে কম ৩৩% । ছেলেদের মস্তিষ্ক ১৩৩৬ গ্রাম আর মেয়েদের মস্তিষ্ক ১১৯৮ গ্রাম, ছেলেদের হৃদপিণ্ড ৩৬৫ গ্রাম মেয়েদের হৃদপিণ্ড ৩১২ গ্রাম, মেয়েদের লিভার ১৪৭৫ গ্রাম আর ছেলেদের ১৬৭৭ গ্রাম,ছেলেদের কিডনি দুটি ৩২২ গ্রাম মেয়েদের ২৭১ গ্রাম, ছেলেদের ফুসফুস দুটোর ওজন হচ্ছে ১২৪৬ গ্রাম মেয়েদের ১০১৩ গ্রাম, এবার চিন্তা করে দেখুন ছেলেদেরকে আমাদের তুলনায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ওজন পরিমাণ সবকিছুই বেশি দিয়েছেন,যাতে পুরুষদের কর্মক্ষমতা মেয়েদের চেয়ে বেশি থাকে।

তথ্যসূত্র:মস্তিষ্কের হিসাবটার রেফারেন্স: Results from a 1994 study published in Der Pathologe - and based on more than 8000 autopsies

বাকিগুলো এখান থেকে: In 2001, French researcher Grandmaison and co-authors published a paper in Forensic Science International analyzing organ weights from 684 autopsies.

নমুনা ২:

রক্তে মেয়েদের হিমোগ্লোবিন কম, মানে অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কম, হাঁপিয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি।

হিপবোন আর পায়ের গঠন এমন কৌণিক যা দৌড়ের উপযোগী নয়, হাঁটু দুটো বাড়ি খাবার সম্ভাবনা বেশি।

বেশি গরমে মেয়েদের পুরুষের চেয়ে কষ্ট হয়। কারণ আমরা ঘামি কম।

এবং বেশি ঠাণ্ডায়ও আমরা কুপোকাত হই, মাথা কাজ করে না, বেশি শীত শীত লাগে।

তথ্যসূত্র

https://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101007210546.htm

নারীদেহে ক্রিয়াবিক্রিয়ার হার (metabolic rate) কম। তাপ উৎপাদন হয় কম। Warwick Medical

School-এর Professor Paul Thornalley বলেছেন BBC-কে।

https://www.her.ie/health/apparently-reason-women-feel-cold-men-448973

আরও দেখুন:

https://www.theguardian.com/science/shortcuts/2017/oct/11/why-women-sewcretly-turn- up-the-heating

https://time.com/5592353/office-temperature-study/

প্রথমে জোর করে দাবি করা হবে বিজ্ঞানে নারী-পুরুষ সর্বসম। যখন দেখা যাবে, না, সর্বসম তো না। এরপর বলা হবে, পেশীশক্তি তো মধ্যযুগীয় মাপকাঠি, ওটা বাদ। এরপর মনের ফাইলটা ধরলে বলা হবে, দুর্বল করে রাখা হয়েছে বলে, নারী মানসিকভাবে কোমল। শেষমেশ সিদ্ধান্ত হবে, তুমি নারীবিদ্বেষী-বর্বর-অসামাজিক সেক্সিস্ট পটেনশিয়াল রেপিস্ট।এমন বহু রিসার্চ আমরা পাবো যেখানে প্রমাণিত হয়েছে নারী-পুরুষ সমান। 'বিজ্ঞান' বলতে আমরা যদিও বুঝি পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান। এবং এটা ভেবেই আমরা বিজ্ঞানকে অন্ধভাবে মেনে নেই যে, এটা পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া গেছে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ভিন্ন। বিজ্ঞান স্বাধীন না, পাশ্চাত্য দর্শন থেকে বিজ্ঞান বের হতে পারে না, পুঁজিবাদের ফরমায়েশের বাইরে কোনো রিসার্চ ডোনেশন পাবে না, প্রচার পাবে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে রেজাল্ট চাইবে বিজ্ঞানকে পদ্ধতি এদিক-সেদিককরে ফলাফলের ব্যাখ্যা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে সেই রেজাল্ট এনে দিতে হবে। সুতরাং বিজ্ঞানকে আমরা যেমন নিরপেক্ষ ভেবে মেনে নিই, অতটা নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হতে পারে না চাইলেও।

'দ্বিতীয়ত,মেয়েদের পারফর্মেন্সে ধারাবাহিকতা নেই। একটানা একই গতির শ্রম মেয়েরা দিতে পারি না। জীবনের ৩ টা সময় মেয়েদের কর্মদক্ষতা ও কর্মধারাবাহিকতা কমে যায়, মানসিক-শারীরিক কারণে।

প্রতিমাসেই নির্দিষ্ট কিছুদিন আমাদের কর্মক্ষমতা কমে যায়, বেরিয়ে যায় ৮০ মিলি রক্ত, মনমেজাজ একই রকম থাকে না।

মেনোপজের পর স্বভাব ও দক্ষতায় অবনতি হয়।

এবং যখন মেয়েরা সন্তান ধারণ করে, সে সময় আমাদের কর্মদক্ষতা লোপ পায়, নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পুরুষের এগুলো কোনটাই হয় না। কর্মে ধারাবাহিকভাবে দক্ষতার লেভেল বজায় রাখায়ও ওরা বেশি এগিয়ে। আমরা মানি আর না মানি।
রিসার্চ জানাচ্ছে, মাসিকের আগে মেয়েদের যে খারাপ লাগে, যাকে বলে Premenstrual Syndrome বা PMS।] এই PMS-এ ৯০% নারীই কোনো-না-কোনো মাত্রায় ভোগে'।
মাসিকের ৫ দিন আগে থেকে নিচের লক্ষণগুলোর এক বা একাধিক আগের ৩ মাস যাবৎ।

মানসিক:

- ডিপ্রেশান (Depression)

রাগে ফেটে পড়া (angry outburst)

- খিটখিটে মেজাজ (irritability)

-উদ্বেগ (anxiety)

-সাড়া না দেওয়া (confusion)

- নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া (social withdrawal)

শারীরিক:

স্তনে ব্যথা

- পেট ফেঁপে থাকা

মাথাব্যথা

হাত-পায়ে পানি আসা

• সবচেয়ে কমন লক্ষণ (খিটখিটে মেজাজ, উদ্বেগ-টেনশন, মেজাজ দ্রুত পরিবর্তন আর অবসাদ- মন খারাপ) ক'টাতে প্রায় ৯০-৮০ নারী ভোগেন বলে জানা গেছে।

• প্রায় ৫০% নারী জানিয়েছেন তারা মনোযোগে সমস্যা ও ভুলে যাওয়ার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

• ৪৮% নারী ভোগেন পেটের সমস্যায় (GI upset)

• আর ১৮% এর হয় শরীর জ্বালাপোড়া (hot flush)

এটা তো মেয়েদের শারীরিক দুর্বলতা এবার দেখেন মানসিক দুর্বলতার মধ্যেও মেয়েরা এগিয়ে: কোনো কাজে বাধাগ্রস্ত হলে পুরুষ সেটা বার বার করে করে ওভারকাম করে, আর মেয়েরা ছেড়ে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেই। মানে ওদের মানসিক শক্তিও আমাদের চেয়ে বেশি। আমি না, রিসার্চ বলছে':

১. পুরুষের টোটাল এবং যৌথ মানসিক শক্তি নারীর চেয়ে বেশি।

২. পুরুষের আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নারীর চেয়ে বেশ অনেকটা বেশি (significantly higher)

৩. পুরুষ পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে আরও বেশি করে কাজে লেগে থেকে (task orientated coping)। মানে কাজে লেগে থেকে উত্তোরণের চেষ্টা করেছে বেশিরভাগ ছেলে।

৪. বেশিরভাগ নারীরা কাজ থেকে দূরে থেকে বা একেবারে ছেড়ে দিয়ে (disengagement and resignation coping) পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে বা উত্তোরণের চেষ্টা করেছে।

একই রেজাল্ট Panjab University-র গবেষণায় যা করা হয়েছিল ৩০ জন পুরুষ ও ৩৫ জন মহিলা জিমন্যাস্টের উপর। এখানেও এসেছে পুরুষদের মানসিক শক্তি বেশ অনেকটা বেশি (significantly higher scores) নারীদের চেয়ে। একইভাবে সাঁতারু, বক্সারদের ক্ষেত্রেও গবেষণা হয়ে একই রেজাল্ট এসেছে।

তথ্যসূত্র:Comparative Study of Mental Toughness between Male, Female and Urban, Rural AIIU Gymnasts, International Journal of Recent Research Aspects, Vol. 4, Issue 1, March 2017, pp. 100-102

◆ এগুলো স্বীকার করে নিলে তো অটো স্বীকারই করে নেওয়া হলো, নারী-পুরুষ আসলে এক না। তখন এই পুরো গেমটা ওভার। আর কতকাল আমরা মনে করবো ঐশ্বরিয়া ২০ টাকার লাক্সের ছোঁয়ায় স্টার হয়ে গেছে?', 'পুরাটা সমাজ তালি দিচ্ছ, কিন্তু কেবল মেয়েটাই জানে সে কীসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। নারীবাদ আমাদেরকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায়

নামিয়েছে। ফলে আমরা দাঁতে দাঁত চেপে দৌড়োচ্ছি, কিন্তু কষ্ট তো হচ্ছে। স্যানিটারি ন্যাপকিনের অ্যাড যতই বলুক 'কোনো বাধা নেই', বাস্তবতা তো ভিন্ন'।

• ৯০% নারী মাসিকের আগে PMS নিয়েই দৌড়োচ্ছে, (১৫২]

• পিরিয়ডের ব্যথায় নারী 'কাত করে ফেলা ব্যথা' নিয়েই দৌড়োচ্ছে কিংবা ছুটি নিচ্ছে। (১৯০১

• প্রায় ৯০% কিশোরী জানে কী প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে তারা ক্লাসে দৌড়োচ্ছে প্রতিমাসে।

নমুনা ৩:

- 'পুরুষের মতো আমরা মেয়রা না, আমাদের কষ্ট হয়। এটা বুঝি আমরা সবাই, কিন্তু জিদ আর হীনম্মন্যতা এই সহজ সত্যটা আমাদের স্বীকার করতে দেয় না'।

- 'হীনম্মন্যতা, কীসের হীনম্মন্যতা আবার? তাই না?

'মাছ ডাঙায় উঠলে যে হীনম্মন্যতায় ভোগে। আমরা ডুবসাঁতারে যে হীনম্মন্যতায় ভুগি। মাছ পানিতে চলতে পারে, আমি কেন পারব না। মগডালে উঠতে গিয়ে মোটা বাঘটা যে হীনম্মন্যতায় ভোগে, বাঁদর পারলে আমি কেন পারব না। মেয়েরাও এরকম একটা জেদ থেকেই শরীরের বিশ্রামের চাহিদাকে দমিয়ে সারা মাস ছুটছে।

- হ্যাঁ, ফলে স্ট্রেস বাড়ছে। শারীরিক মানসিক দুটো স্ট্রেসই।সামান্য স্ট্রেসেও নারী দেহে প্রভাব পড়ে বেশি।আর শারীরিক শ্রমও কিন্তু একটা স্ট্রেস।

• অধিক শারীরিক শ্রম নারীকে বন্ধ্যা করে ফেলে।

• আমেরিকান আর্মিতে নারী সৈন্যরা ৩ গুণ বেশি বন্ধ্যাত্বে ভুগছে সিভিলিয় নারীদের চেয়ে।

• উত্তর কোরিয়ার নারীসেনাদের পরিশ্রমের কারণে মাসিকই বন্ধ হয়ে যেত বছে পর বছর, যেটা নারীদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

• শিফটিং ডিউটি করে যেসব মেয়েরা, নর্মালের চেয়ে তাদের মোট ডিম্বাণু ৮.৬৮ কম। আর পরিণত ডিম্বাণু কমে গেছে ১৪.১%।

পুরুষের মতো শারীরিক পরিশ্রমের সেক্টরে মেয়েদের মতো করে কাজ কর গেলেও নারীর কষ্ট হয়, নারীত্ব নষ্ট হয়।

নমুনা ৪:

ভয়: ৯৯ ভাগ নারী প্রকৃতিগত ভাবেই ৯৯ ভাগ পুরুষের তুলনায় ভীতিপ্রবণ।নারীর এই 'ভয়' হলো মানবপ্রজাতি টিকিয়ে রাখারই একটা কৌশল। যাতে করে ছোটো ছোটো বিষয়ে, বিপদের ক্ষুদ্রতম আভাসে নারী সতর্ক হয়, উতলা হয় এবং সন্তানকে আগলে ফেলে।
নারীর এই ভীতিপ্রবণতাও তেমনি স্রষ্টাপ্রদত্ত অস্ত্র; এটা দুর্বলতা নয়।

এই ভীতি বা উতলা ভাবের (ইনসিকিউরিটি) কারণে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি সিদ্ধান্তহীনতায় বা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে- 'এটা না ওটা'। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। এই 'ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কা' নারীর মমতা, মাতৃত্ব আর সন্তানবাৎসল্য থেকে উৎসারিত। এটাই নারীত্ব। যে উদ্দেশ্যে 'প্রকৃতি' তাকে বানিয়েছে, সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে দেওয়া হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য প্রজাতির ধারা বজায় রাখা। এটা স্বীকার করে নিলে নারী ছোটো হয় না। নারীত্বের পূর্ণতাই নারীর মহিমা।

এর প্রয়োজনটাও সেই প্রজাতি টিকিয়ে রাখার কৌশল। যে-কোনো কিছুকে বিপজ্জনক মনে করলে পুরুষ সে লাভ-ঝুঁকি সাত-পাঁচ কম ভাববে, বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিবে, এবং পরিবার রক্ষায় পেশীশক্তি ব্যবহার করবে যা তাকে দেওয়া হয়েছে। এই কাজ নারী জাতিও করে, কিন্তু পরে, শেষ মুহূর্তে। আর পুরুষ করে আগেই। এই বেপরোয়া ভাব পুরুষের প্রথম অস্ত্র, আর নারীর শেষ অস্ত্র-প্রজাতি বাঁচানোর।

নমুনা ৫:

সিদ্ধান্ত গ্রহণ:মু'মিনের একটা গুণ হলো, সে পরামর্শ করে সব কাজ করবে।

দ্বীনদার স্বামী অবশ্যই খামখেয়ালি হবে না, সব বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ নেবে।

পরামর্শ করার পর সিদ্ধান্তের বিষয় আসে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে একজনকে। সিদ্ধান্তদাতা দুজন হতে পারে না। কোনো বিষয়ে সার্বিক লাভ-ক্ষতি বিচার করে 'কিছু ক্ষতি সত্ত্বেও' একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হয়, লাভের পাল্লা ভারি রেখে। এজন্য লাভ বেশি দেখে ঐ ঝুঁকিটুকুকে অগ্রাহ্য করতে হয়। ফাইনাল সিদ্ধান্তটা নিতে হয় কিছুটা বেপরোয়া হয়ে। কিছুটা ড্যাম কেয়ার ভাব না নিলে শেষ মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। রিস্ক সব ডিসিশানেরই অংশ।
স্ট্রেস বাড়লে মানে কোনো একটা সমস্যার সম্মুখীন হলে, পুরুষ বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নেয়, আর মেয়েদের উপর কোনো প্রভাব হয় পড়ে না, না হয় মেয়েরা আরও পিছিয়ে যায়।

নারী তার স্বভাবগত ভীতি ও দ্বিধা দিয়ে কোনো সিদ্ধান্তের লাভ-ঝুঁকি তুলে ধরবে।

আর পুরুষ তার স্বভাবগত বেপরোয়া ভাব দিয়ে ঝুঁকি বরদাশত করে লাভের দিকে চোখ রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে ও ঝুঁকি প্রথম ফেস করবে। এভাবেই দুজনের সম্মিলিত মিটিং-এ পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান চলবে ও এগিয়ে যাবে।

আচ্ছা যদি উলটোটা হয়। যদি নারী ডিসিশান মেকার হয়? কী হবে বলেন দেখি?

পুরুষ বেপরোয়া অপশন দিবে তার স্বভাবসুলভ, ফলে নারী আরও কনফিউজড যাবে, সেই সাথে স্বভাবসুলভ দ্বিধা ও সিদ্ধান্তহীনতা তো আছেই।

◆আমাদের বায়োলজি আলাদা, তার সাথে মিলিয়ে আমাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা হওয়াই বায়োলজির দাবি, শরীরের দাবি।পুরুষের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে আমরা কেবল নিজেদের উপরই স্ট্রেস বাড়াচ্ছি-এই সত্যটা আমরা যত স্বীকার করবো, তত নারীর জীবন আরামের হবে, সম্মানের হবে।নারী-পুরুষ যে ভিন্ন, এটা মেনে নিলে দুজনার জীবনই সুন্দর হয়। আরও বেশি একো অপরের প্রতি সহমর্মী হয়, সহযোগিতার হাত বাড়ায়। আর প্রতিযোগিকে সবাই হারাতেই চায়, হাত গুটিয়ে নেয়।(সহায়তা:ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বই)

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তো জানেন কার কি পরিমান ক্ষমতা বা কর্ম দক্ষতা আছে সেজন্যই তো তিনি বলেছেন আমি পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি যে বিষয়ে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি সে বিষয়ে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিয়ষয়ে জ্ঞাত (সূরা নিসা: আয়াত-৩২)

পর্দা কি নারীদের প্রগতির অন্তরায়

সভ্যতার দাবীদারগণ পর্দাকে অবনতির কারণ ও মহিলাদের উদ্ভাবন ও উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করে এবং তাদের মতে, পর্দা এমন মারাত্মক প্রতিবন্ধক যা মহিলাদের জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বড় বাধা এবং তা উন্নয়নশীল দেশগুলো সভ্যতার যে অগ্রগতিতে পৌঁছেছে সে অগ্রগতিরও বড় বাধা।

ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে আমরা বলব: আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও প্রযুক্তির সাথে পর্দার কি সম্পর্ক রয়েছে?

তবে কি উন্নয়ন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য নারীদেরকে স্বীয় পোষাক বর্জন করে পুরুষদের সামনে উলঙ্গ হওয়া শর্ত? তবে কি উন্নয়ন ও সভ্যতা- সংস্কৃতির জন্য নারীদেরকে পুরুষদের সাথে তার পাশবিক সম্ভোগ ও পশুত্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করার জন্য অংশগ্রহণ শর্ত?

আধুনিকতা ও সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য কি এটা শর্ত যে, নারীর শুধু বাহ্যিকভাবে দেহ থাকবে, থাকবে না তার আত্মিক সম্ভ্রম, আর না থাকবে তার আত্মমর্যাদা?

পর্দা কি আমাদের গাড়ী, উড়োজাহাজ, ট্যাংক এবং সব ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের অপারগতার কারণ?

ইতোপূর্বেই অধিকাংশ আরব ইসলামী দেশগুলোর মহিলারা পর্দা বর্জন করে নগ্নতা গ্রহণ করেছে, পর্দাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতঃ পদদলিত করে পুরুষদের সাথে কর্মের জন্য বেরিয়ে পড়েছে এবং তাদের সাথে অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে তারা জড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেসব দেশের নারীদের পর্দা থেকে নগ্নতা গ্রহণের ফলে কি তারা উন্নতি করে ফেলেছে?

তারা কি নারী- পুরুষের সংমিশ্রনের কারণে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির উচ্চশক্তি ও উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে? উন্নয়ণশীল দেশসমূহ যে শক্তি ও উন্নতিতে পৌঁছেছে তারা কি সে অবস্থানে পৌঁছতে পেরেছে? যাদের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটোর অধিকার রয়েছে, সেই বৃহৎ পরাশক্তিধর দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত কি তারা হতে পেরেছে? তারা কি অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, সামাজিক ও চারিত্রিক সমস্যাবলী থেকে মুক্তি পেয়েছে?সবগুলোর উত্তর স্পষ্ট, ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

চলেন আমরা ইসলামের স্বর্নযুগের নারীদের দেখে আসি:

💖ইসলামের আগে ৩২০০ বছরে ডাকসাইটে সব সভ্যতা মিলে ১০০ জন স্কলার নারী দিতে পারেনি। আর ইসলাম এসে প্রথম ১০০ বছরেই দেড়শ নারী দিল, যাদের কাছে মানুষ আসত... শিখতে। পুরুষরাও, আর মহিলারা তো বটেই। এনাদের মাঝে অন্তত ২২ জন ছিলেন এক্সপার্ট পর্যায়ের, যাদের মধ্যে নবিজির সম্মানিতা স্ত্রীগণও আছেন। বিশেষ করে আম্মাজান আয়িশা রা. ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাবতী-আইন, হাদীস, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত।

আয়িশা রা. এর ভাগ্নে উরওয়া বিন যুবাইর রা.পর্দার ভিতরে খালার সাথে বসে থাকতেন। বাইরে পুরুষ শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত, ফতোয়া জানতে আসত। আম্মাজান ভাগ্নেকে বলে দিতেন, ভাগ্নে জোরে বলে দিতেন। পর্দার সাথেই তিনি উম্মাহর শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করেছেন।

'ইউরোপের সাথে কিছুটা তুলনা দিলে আরো ভালো বুঝা যাবে ব্যপারটা, ইউরোপ ডাইনী-নিধনের (witch-hunt) নামে তিনশত বছর ধরে ৪ থেকে সাড়ে ৬ লাখ নারীকে হত্যা করছিল। [২৯] সময়টা হিজরি মোতাবেক ৮৫০-১১৫০ হিজরি। সেই সময় মুসলিম মেয়েরা কী করছে দেখ। ধুমসে পড়ছে আর পড়াচ্ছে।

• আয়িশা বিনতে জারুল্লাহ শাইবানি ২২০। বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে ১০৫ জন শিক্ষকের কাছে সনদ নিচ্ছেন।

• আসিয়া বিনতে মুহাম্মাদ ইরবিলি ২০০ এর অধিক উস্তাদের থেকে সনদ নিয়েছেন।

• উম্মুল হায়া উমামাহ (২৯] আরবি ব্যাকরণের বইগুলো মুখস্থ করছেন।

• বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কন্যা যাইবুন্নিসা (২২খ কুরআন- হাদীস-ফিকহ- ক্যালিগ্রাফি শিখছেন।

শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম (২২০১ শিখছে উচ্চারণশাস্ত্র, ক্যালিগ্রাফি, ফার্সি, সাহিত্য।

• উম্মে হানি বিনতে নুরুদ্দীন (২০। তখন ৭ জন উস্তাদের কাছে শিখছেন ৫০ এর অধিক বই।

এত কেবল বললাম শিক্ষার্থীদের অবস্থা,শিক্ষকার অবস্থা দেখি:

• আয়িশা বিনতে আল-যাইনা। এবং সারা বিনতে উমার হামাবী। বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সেশান নিয়ে চলেছেন।

• শাইখা আসমা বিনতে কামাল। বিশেষভাবে মেয়েদের ক্লাস নিচ্ছেন।

• হাদীসবিদ যাইনুশ শারীফা ২২৯। ও তাঁর বোন মুবারাকাহ মিলে মক্কার মতো জায়গায়, যেখানে হাদীসের পুরুষ প্রফেসর ৭০০। গিজ গিজ করত সব সময়। সেখানে হাদীসের সর্বোচ্চ কিতাব বুখারি শরীফ ২০১১-সহ অন্যান্য বড়ো বড়ো কিতাব পড়াচ্ছেন।

• মক্কার ফকীহা কুরাইশ আল-তাবারী শ্রেষ্ঠ ৭ জন হাদীসবিদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি বাগিয়ে নিচ্ছেন পুরুষদের ডিঙিয়ে।

• মদীনার দীর্ঘজীবী শাইখা মুফতী ফাতিমা বিনতে শুকরুল্লাহ নিজ বাসায় পুরুষ- মহিলাদের লেকচার নিচ্ছেন ১০ বছর ধরে।

এবার দেখ, শিক্ষকতায়ই যদি নারীর এমন ডাকসাইটে পদচারণা থাকে, তা হলে সাধারণ নারীদের শিক্ষার অবস্থাটা কল্পনা করা যায়।

ইসলাম এসে প্রথম ৪০ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিতে নারীর মতামতকে মূল্যায়ন করেছে, যখন ইউরোপ এসব কল্পনাও করতে পারত না।

উমার রা. খলীফা থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিদূষী নারীদের মতামত নিতেন।

এ ছাড়া শিফা বিনতে আবদুল্লাহর যুক্তি পরামর্শ খুব প্রাধান্য দিতেন, তার চৌকসবিদ্যাবুদ্ধির কারণে।

তৃতীয় খলীফা নির্বাচনে বিশেষ বিশেষ নারীদের থেকে রায় নিয়েছেন সমন্বয়ক আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)।

তথ্যসূত্র:ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বই (পৃষ্ঠা -৯৪,৯৫)

◆ পরের প্রজন্মে উন্মুদ দারদা রা. দামেশকের মাসজিদে লেকচার দিতেন। আর লেকচারে এসে বসতেন খলীফা আবদুল মালিক নিজে।

এজলাসে ঢুকে মদীনার চীফ জাস্টিসকে কুরআনের দলিল দিয়ে চ্যালেঞ্জ। মামলা ঘুরিয়ে দিলেন আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান রহ.। মামলা চলে অমুসলিম আসামির পক্ষে।

দুই-দুইটা সুপার-পাওয়ারকে দখলকারী খলীফা উমারকে গণজমায়েতের মধ্যে
দলিল দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে মতো পরিবর্তনে বাধ্য করলেন খাওলা বিনতে সালাসা (রা.)।

এগুলো যদিও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু এগুলো থেকে পুরুষের চিন্তাজগতের পরিবর্তন টের পাওয়া যায়। নারী এই পরিমাণ সামাজিক মর্যাদা পেয়েছে প্রথম ৫০ বছরের মাঝে। পুরুষের মেন্টাল সেট-আপ পরিবর্তনের যে চিন্তা আজকে নারীবাদীরা করছে, সেটা ইসলাম কত দ্রুততার সাথে করেছে, দেখুন।

একজন নারীর দেওয়া কুরআনের দলিলের উপর নিজের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছে স্বয়ং খলীফা,

বিচারপতি নারীর যুক্তিকে মেনে বিচার বদলে নিচ্ছেন, স্বীকার করে নিচ্ছেন নিজের ভুল।

নারীদের কাছে পুরুষেরা এসে শিক্ষা নিচ্ছে-মানে ৫০ বছরে পুরুষের সাইকোলজি সেভাবে বদলে দিয়েছে ইসলাম।

ঠিক ৫০ বছর আগে, উমার রা. বললেন যে, আমরা নারীদের গোনায়ই ধরতাম না। তারা আজ রাষ্ট্রীয় ইস্যুর বিষয়েও নারীদের ইনভলভ করছেন।

'চিন্তা করা যায়,ইসলাম নারীদের জন্য একটা বিপ্লব। অথচ সেই নারীরাই আজ ইসলাম নিয়ে অন্ধের মতো প্রশ্ন তুলছে বারবার। নিজেদের সমাধান রেখে ইউরোপের পুঁজিবাদের ফাঁদকে ভাবছে সমাধান।
শুধু সেই যুগেই না ,পরবর্তী যুগেও মর্যাদা আর সম্মানের জায়গায় রাজত্ব করেছে আমাদের মেয়েরা। ইউরোপ যখন ডাইনী বলে লক্ষ লক্ষ মেয়েকে পুড়িয়ে মারছে,

• ফাতিমা বিনতে ইয়াহিয়া। তখন নিজ বিচারপতি পিতার সাথে নানান মামলারবিষয়ে বিতর্ক করছেন। বিচারপতি স্বামীও কঠিন মামলায় তাঁর সাহায্য চাইতেন। এগুলো হলো ইসলামে নারীর ক্ষমতায়ন। পয়সার টুংটাং-এ ইসলামের নারীরা নাচে না। ইসলামে নারী ক্ষমতায়িত হয় যোগ্যতা-জ্ঞান-চরিত্র-তাকওয়ার বলে।

• শাইখা আসমা বিনতে কামাল। মেয়েদের প্রফেসর ছিলেন। প্রাফেসর বললাম তোমার বোঝার জন্য। ওনারা ছিলেন মুহাদ্দিসা, হাদীসের বড়ো উস্তাযা। তাঁর এই পরিমাণ খ্যাতি-মর্যাদা-গ্রহণযোগ্যতা ছিল যে, পুরুষ লোকেরা বিভিন্ন সুপারিশ করাতে আসত। তিনি তাদের জন্য সুলতান-কাযীদের কাছে সুপারিশপত্র লিখে দিতেন এবং তাঁর সুপারিশ গৃহীত হত।

• হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'তুহফাতুল ফুকাহা' লিখেছেন বাবা। এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বাদায়ুস সানাওয়ি' লিখেছেন স্বামী। আর এই বইয়ের ভুলচুক সংশোধন করে দিতেন ফাতিমা। যে-কোনো লিগ্যাল ডকুমেন্টে বাপ-বেটি- জামাই ৩ জনের স্বাক্ষর থাকত।

• শাইখ আকরাম নদভী সাহেবের ৪০ খণ্ডের একটা বিশ্বকোষ আছে। সেখানে ৮০০০ নারী মুহাদ্দিসা মানে প্রফেসরের জীবনী সংকলন করেছেন। যাঁদের কাছে পুরুষরাও শিখতে আসত, শারঈ পর্দার সাথে। তোমাকে সমাজ-মানস চিন্তা করতে হবে। যে সমাজ সপ্তম শতক থেকে আজ পর্যন্ত ১৩০০ বছরে 'উল্লেখযোগ্য' লেভেলের ৮০০০ নারী মুহাদ্দিসা তৈরি করেছে, সেই সমাজ মানসে নারীর অবস্থান কোথায় ছিল, সেটা বুঝে নিতে হবে। ইসলাম-পূর্ব যুগ আর ইসলামের পরের যুগের এই কনট্রাস্টটা আমাদের বুঝতে হবে ।।।।

'ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীদের এত ক্ষমতায়নের ফিরিস্তি দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি,যেটার পিছনে ইউরোপ ঝেড়ে দৌড়োচ্ছে, সেসব আমরা পিছনে রেখে এসেছি। নারীর মূল ক্ষমতায়ন কিন্তু হয়েছে ঘরে। জাতি গঠনে ও দেশের উৎপাদনে নারীর মূল ভূমিকাটা কিন্তু ঘরেই, যা তার বায়োলজির অনুকূল, তাঁর সহজাত ঝোঁক মোতাবেক। নারীর এই ভূমিকা পুরুষতন্ত্র ঠিক করে দেয়নি, ঠিক করে দিয়েছে নারীর বায়োলজি, এবং বায়োলজির স্রষ্টা।
-মারইয়াম ও আসিয়া রা.-এর মাতৃত্ব এবং খাদীজা ও ফাতিমা রা.-এর স্বামীপরায়ণতা। ঘরের যে ভূমিকাগুলোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে আমাদের শেখানো হয়েছে; আল্লাহর ফায়সালা হলো, এই কাজগুলোর মাধ্যমেই তিনি নারীদের শ্রেষ্ঠত্বের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠত্বের স্ট্যান্ডার্ডই আলাদা।

'এই যে ৮০০০ নারী মুহাদ্দীসের কথা আমরা জানলাম, তারা বাদে নাম না জানা কোটি কোটি মুসলিমাহ ঘরে মা ও স্ত্রী হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন। রত্নগর্ভা হয়েছেন, মুজাহিদ-আলিম-দার্শনিক-বিজ্ঞানী গড়ে তুলেছেন, ইসলামি সভ্যতার পিছনে তাঁদের অবদানই তো বেশি, নাকি? নারী মুহাদ্দীসদের বিকল্প পুরুষ মুহাদ্দীস ছিলেন। কিন্তু এইসব সফল পরিবার সংগঠকদের কোনো বিকল্প ছিল না।'

যেখানে মেয়েদের বিকল্প নেই, সেখানেই তো মেয়েরাই সবচেয়ে সম্মানিত, মেয়েরা সেখানে ওয়ান অ্যান্ড অনলি, সর্বেসর্বা।

উপসংহার

নারীপুরুষের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ও সমান গুরুত্বপূর্ণ, পরিপূরক। একটা ছাড়া আরেকটা অসম্পূর্ণ। এবং এই আলাদা আলাদা দায়িত্ব পালন যার যার উপর ওয়াজিব। (তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন)
ক্যারিয়ারের জন্য সন্তানের স্বাস্থ্য-দীক্ষা-মানসগঠন বিসর্জন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ইসলামে, একজন নারীর ক্ষেত্রে। আয়নায় নিজেকে দেখে খুশি হওয়ার জন্য পরিবারের দায়িত্ব আধাখেঁচড়া করে নিলাম, এই কম্প্রোমাইযের বৈধতা ইসলাম দেয় না।ইসলামের ভ্যালু সিস্টেম আলাদা।ইসলামের দৃষ্টিতে চাকা তো সমানই। পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে, নারীবাদের দৃষ্টিতে, Male value system-এই না একটা ছোটো, একটা বড়ো।

নারীরা ঘরে কাজ করেন বা করবেন, এটা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব না। বরং ঘরে নারী কাজ করে বলে নারী বেকার, পুরুষের সাপেক্ষে তার কোনো অবদান নেই। এইকথাটাই পুরুষকেন্দ্রিক কথা, পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আমাদের নারীবাদীরা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেই কথা বলছে।নারীবাদীরা তো Male value system-এই নারীকে বিচার করছে।

পুঁজিবাদকে যে সার্ভিস দেয় না সে বেকার।ঘরের কাজ নিজে করলে জিডিপিতে আসে না, লোক রেখে করালে জিডিপিতে (জিডিপি হলো, শুধু অর্থ ও উৎপাদনের ভিত্তিতে উন্নতিকে মাপার রাষ্ট্রীয় ভ্যালু সিস্টেম)আসে। নিজের বাচ্চা নিজে পাললে পুঁজিবাদের ঘরে ফসল ওঠে না, ডেকেয়ারে-কিন্ডারগার্টেনে দিয়ে আসলে লাভ।আশাকরি নারীবাদের এই ফাঁকাবুলি কতটা ভয়ঙ্কর।

মানব প্রজাতিকে পৃথিবীতে আনা ও যোগ্য করা নিজেই এতবড়ো গুরুদায়িত্ব, যা একাই পুরো দিন দাবি করে, পুরো শক্তি দাবি করে, পুরোটা মেধা দাবি করে। প্রজাতি টিকিয়ে রাখতে যে সীমাহীন কষ্ট আমাদের সহ্য করতে হয়, তার বদলায় ইসলাম আমাদেরকে বাকি সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। কামাই, জিহাদ, জামাআতে নামাজ, প্রশাসন-সব ভারি দায়িত্ব থেকে নারীকে দূরে রেখেছে ইসলাম। আজ যে নারী ঘর-বাহির দুটোই সামলাচ্ছে, লাভ হচ্ছে পুঁজিবাদের। মাঝখান থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে নারীর শরীর।

🌷 যেহেতু আমাদের ক্ষমতায়নের একমাত্র মাপকাঠি না, সুতরাং ইসলামের ভ্যালু সিস্টেমে নারীর ঘরের কাজ আর পুরুষের বাহিরের কাজ সমান। নারী ঘরে কাজ করেও ক্ষমতায়িত।

একজন নারী সাহাবি এসেছেন, নাম আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা.। এসে নবিজিকে জিজ্ঞেস করছেন: আমরা তো ঘরে থাকি আর আপনাদের সন্তান ধারণ করি। আর পুরুষ জানাযা ও জুমআয় শরীক হয়, অসুস্থকে দেখতে যায়, হাজ্জের পর হাজ্জ করে, এবং তার চেয়েও বেশি করে মানে জিহাদে যায়। অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়। যখন পুরুষ জিহাদে-হাজ্জে-উমরায় যায়, আমরা তাদের সম্পদ দেখাশোনা করি, তাদের জন্য কাপড় বুনি, তাদের বাচ্চাদের লালনপালন করি। আমরা কী পুরস্কারের অংশ পাব না? নবিজি বললেন: গিয়ে সব মেয়েদের জানিয়ে দিয়ো।

স্বামীর খেয়াল রাখা, তাকে সন্তুষ্ট রাখা এবং তার সম্মতি নিয়ে বের হওয়া- এই ক'টা কাজ যদি করো, সমান প্রতিদান মিলবে তোমাদের।[উর্দু গুনাহ,ইবনুল আসীর]

অর্থাৎ নারী-পুরুষ দুজনার কর্মক্ষেত্র প্রতিদানের দিক দিয়ে সমান। ইসলামের ভ্যালু সিস্টেম এটাই।সুবহানাল্লহি ওয়াবিহামদিহি।

ত্বলিবার নাম:সুমাইয়া আক্তার
রোল:২২৭০২০৯২৫
ব্যাচ:২২৭